বাংলাদেশ ব্যর্থ বাই ফায়ার

জ্যাক এন্ডারসন জর্জ ক্লিফোর্ড

বাংলাদেশ ব্যর্থ বাই ফায়ার

জ্যাক এন্ডারসন
জর্জ ক্লিফোর্ড

ভাষান্তর
মাসুদুল হক

বাংলাদেশ
বার্থ বাই ফায়ার

Northern University * Bangladesh *
NUB
Library

বাংলাদেশ
বার্থ বাই ফায়ার

NUB LIBRARY
ACCESSION NO
ACCESSION
PROCESSING

মূল
জ্যাক এন্ডারসন
ও
জর্জ ক্লিফোর্ড

ভাষান্তর
মাসুদুল হক

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. ৯৪৪০১
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

বাংলাদেশ : বার্থ বাই ফায়ার
মূল : জ্যাক এন্ডারসন ও জর্জ ক্লিফোর্ড
ভাষান্তর : মাসুদুল হক

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কম্প্লেক্স, ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ : সুখেন দাস। বর্ণবিন্যাস : আবির কম্পিউটার। মুদ্রণ : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ বিভাগ। গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র।

BANGLADESH : BIRTH BY FIRE by : Jack Andarson O Jorj Kliford. Translated by Masudul Haq. Published by : Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, Concord Emporium Shoping Complex, 253-54 Elephant Road, Katabon, Dhaka-1205. Cover design : Sukhen Das. Copyright : Author. Date of Publication : February 2013.

Price : Tk. 125.00, US $ 3.00

ISBN : 984-70000-0207-5

অনুবাদকের নিবেদন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিকসন ও তার নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি, গণতন্ত্রপ্রিয় মার্কিন জনগণ এবং বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে যে প্রতারণার খেলায় নামেন, যা ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে মানব সভ্যতাকে এক ভয়াবহ বিশ্ব যুদ্ধের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়— এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অপর দুই বৃহৎ শক্তি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত এই দৈমাতৃক বদ্বীপ অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর ভাগ্য নিয়ে নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কুৎসিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়,—বিশ্বখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসন ও তার সহযোগী জর্জ ক্লিফোর্ড পর্দার অন্তরালের সেই বিস্ময়কর কাহিনী তুলে এনেছেন তাদের 'এন্ডারসন পেপারস' গ্রন্থের 'বাংলাদেশ : বার্থ বাই ফায়ার' অংশে, যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

এই অনুবাদ গ্রন্থ পাঠকের সমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আরেক অজানা দিকেরই শুধু উন্মোচন করবে না— আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে একটি মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাসুদুল হক

সূচিপত্র

যুদ্ধ শুরু করতে হয় কি করে	৯
সহিংসতার উপাদান	১৩
যুদ্ধের পায়তারা	২০
একনায়ক ও কূটনৈতিক	২৫
প্রতারণার রাজনীতি	২৯
অশুভ সংকেত	৩৫
সত্যে রঙ চড়ানো	৪০
ইয়াহিয়ার জন্যে সাহায্য	৫০
জর্ডান থেকে বিমান প্রেরণ	৫৩
কূটনীতি ও প্রচার	৫৭
বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায়	৬৩

যুদ্ধ শুরু করতে হয় কি করে

পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার ত্রিশ বছর পর প্রেসিডেন্ট নিকসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি এনে দাঁড় করান। তার কর্মধারা ছিল ধীর, সতর্ক, স্বেচ্ছাকৃত এবং সম্পাদন করেন অত্যন্ত গোপনে। এবং তার কার্যধারা নিয়ে মার্কিন জনগণের সঙ্গে করেন মিথ্যাচার। শান্তির কথা বলেই ঝুঁকি নেন যুদ্ধের।

কংগ্রেসকে প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকার, যে অধিকার বলে একমাত্র কংগ্রেসই পারে আমেরিকানদের যুদ্ধে পাঠাতে, মার্কিন প্রেসিডেন্টরা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সর্বত্র সেটার বিকৃত করেন, বিপথে চালিত করেন এবং দলামোচড়া করেন, ইচ্ছামতো আমেরিকানদের যুদ্ধের আগুনে নিক্ষেপ করেন। সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদের দু'নম্বর ধারায় এই অধিকার পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। কোন বৈশিষ্ট্য আরোপে কিংবা দ্ব্যর্থকের উপস্থিতিতে তা তরলীকৃত হয় নি। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা কংগ্রেসেরই থাকবে।"

গত অর্ধ শতাব্দীকালে কংগ্রেস একবারই যুদ্ধ ঘোষণা করে,—১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে; অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে। একই সময়কালে আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা বিনা অধিকারে বিভিন্ন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে যুদ্ধ শুরু করার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সে সব অনধিকার চর্চার কিছু কিছু এখনো জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কোরিয়ার অমীমাংসিত কুৎসিত যুদ্ধে ১ লাখ ৫৭ হাজার মার্কিনীকে যুদ্ধে পাঠানোরে আগে হ্যারি ট্রুম্যান কংগ্রেসের অনুমতি গ্রহণ করেন নি। ১৯৫৭ সালে অবরুদ্ধ লেবানন সরকারকে ঠেকনা দিতে ডুয়াইট আইজেন হাওয়ার বৈরুতে নৌসেনা ও প্যারট্রুপার পাঠান কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই। আইজেন হাওয়ার দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রথমবার যখন সৈন্য প্রেরণ করেন, সে সময়ও কংগ্রেসের পরামর্শ নেয়া হয় না। কিউবায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণ নিয়ে সৃষ্ট সংকটে কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে জন কেনেডি নৌ অবরোধের আদেশ দেন, যা ছিল যুদ্ধে নেমে পড়ারই সামিল। ১৯৬৫ সালে লিন্ডন জনসনের ডেমিনিকান রিপাবলিক আক্রমণ কংগ্রেস অনুমোদন করে নি। এমন কি গুয়াতেমালা এবং লাওসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সি আই এ) যে গোপন যুদ্ধ শুরু করে, তা-ও জানানো হয় না কংগ্রেসকে।

কূটনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম এবং এ সম্পর্কে জনসাধারণকে যা বলা হয়; তার ওপর প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণ এত কঠোর যে, তাতে জনসাধারণকে যুদ্ধংদেহী করে তুলতে তিনি ঘটনা ও নানা মতধারাকে পরিচালনা করতে পারেন এবং সেই বিন্দুর প্রতি জাতিকে ধাপে ধাপে পরিচালিত করতে পারেন যেখানে যুদ্ধ অনিবার্য।

ইউলিসিস এস. গ্রান্ট তার স্মৃতিকথায় মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে আমেরিকানদেরও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের বর্ণনা লিখে গেছেন। স্মৃতি কথায় তিনি বলেছেন, মেক্সিকান বসতি থেকে দূরবর্তী বিবদমান ভূখণ্ডের কাছাকাছি মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতি সংঘর্ষ সৃষ্টি হবার জন্যে যথেষ্ট প্ররোচনামূলক হতে পারে নি। আমরা সৈন্য পাঠাই যুদ্ধ শুরু ও উসকানি তৈরিতে। মেক্সিকো আগে নেমে পড়ুক, এটা আমাদের জন্যে ছিল অপরিহার্য। কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা করবে কিনা; সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু মেক্সিকো যদি আমাদের সৈন্যদের ওপর হামলা করে, তাহলে নির্বাহিকরা ঘোষণা করতে পারেন, 'যেহেতু ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যকলাপের জন্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান' এবং শক্তিমত্তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। একবার শুরু করা গেলে খুব কম লোকই মিলবে, যারা এর বিরোধিতা করতে সাহসী হবে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যুদ্ধে লিপ্ত জাতির যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে বিরোধীতা করেছে যে ব্যক্তি— তা সে যুদ্ধ ন্যায় হোক অথবা অন্যায়, বিরোধিতাকারী ব্যক্তি জীবনে কিংবা ইতিহাসে ঈর্ষনীয় স্থান লাভ করে নি। একক ব্যক্তি হিসেবে তার জন্যে উত্তম হচ্ছে, যে যুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, তার বিরুদ্ধবাদী না হয়ে বরং যুদ্ধ, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষেও' প্রবক্তা হওয়া।

আমাদের কালেও গোপনীয়তার আড়ালে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে লিন্ডন জনসন শান্তিবাদী প্রার্থীর ভড়ং দেখান। অন্যদিকে তিনি ভিয়েতনামে যুদ্ধ বিস্তারের চক্রান্ত করতে থাকেন। পূর্বসূরী প্রেসিডেন্টদের মতোই তিনি ভাবেন, জাতির জন্যে সবচেয়ে উত্তম কী হতে পারে, তা তিনি জানেন। তিনি মনে করেন, 'সম্পূর্ণ চিত্রটি তিনিই মাত্র অবলোকন করেন' এবং সেটা জনগণকে দেখালেও যাবে না। যে চিত্রটি হোয়াইট হাউসে তার সামনে উপস্থাপিত করা হয়, তা গোয়েন্দা বিভাগের কাঁচিতে ছেঁটে জোড়া লাগানো, যা বন্যার স্রোতের মতো ওয়াশিংটনে প্রেরিত হয় সারা বিশ্বের বিভিন্ন পকেট থেকে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত মতামত গঠন করা হয় গোয়েন্দা রিপোর্ট ও কৌশলগত বিশ্লেষণ থেকে এবং সেই বিশ্লেষণে জোর দেয়া হয় কমিউনিস্ট ভীতি সম্পর্কে। জনসন ভিয়েতনামে দিক নির্দেশনার সিদ্ধান্ত নেন যাতে তার পরবর্তী প্রেসিডেন্টদের ফিলিপাইন অথবা হাওয়াই নিয়ে দিক নির্দেশনায় যেতে না হয় কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন একটি জাতীয় সংহতি প্রর্দশনের প্রয়োজন রয়েছে, যা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে এই ধারণা দেবে যে, তারা আমেরিকানদের সংকল্পের দৃঢ়তাকে দুর্বল করতে পারবে না। সেই সুযোগও এসে যায় যখন কমিউনিস্টদের সন্ধানী নৌযানগুলো খুঁজে ফিরছিল আক্রমণকারী জাহাজগুলোকে এবং টনকিন

উপসাগরে আমেরিকান ডেস্ট্রয়ারকে আক্রমণ করে বসে। কেউই আহত হয় নি। কোন ক্ষতিও হয় নি। দ্বিতীয় রাতে 'আক্রমণ' কখনো সংঘটিত হতো না কিন্তু ঘটনা ঘটে যায় ত্রুটিপূর্ণ রাডারের কারণে। এই সন্দেহজনক যন্ত্রটির সহায়তায় জনসন কৃত্রিম ঘটনা তৈরি করেন এবং জাতিকে উজ্জীবিত করতে একে ব্যবহার করেন।

প্রেসিডেন্ট জনসন সিনেটের সিদ্ধান্ত চাচ্ছিলেন। গ্র্যান্টের সেই রাজনৈতিক পাঠ 'যুদ্ধের বিরোধিতা যারা করে,'— সিনেট সম্ভবত সেটা মনে রেখেই তাকে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকানদের ভূমিকা বিস্তারে লাইসেন্স হিসেবে তিনি তার ব্যবহার করেন। না সিনেট, না জনগণ— কেউই জানতে পায় না জনসনের সামরিক কৌশলের গোপন দিক অথবা টনকিন উপসাগরে আসলে কী ঘটেছিল । তা যখন জানলো ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভিয়েতনামে ৬০ হাজার আমেরিকানকে জীবন দিতে হবে অথবা যুদ্ধ-ব্যয় দাঁড়াবে ১৫০ বিলিয়ন ডলার কিংবা জাতীয় মর্যাদায় যে ধস নামবে অথবা স্বদেশে জনগণের মাঝে যে বিভাজন ঘটবে, এসব বিষয়ে সিনেট কিংবা জনগণের আসলে বলার কিছুই ছিল না।

দু'বছর আগে জন কেনেডি নিকিতা ক্রুশ্চেভের সঙ্গে এক পারমাণবিক শক্তি প্রদর্শনীতে বিজয়ী হন। অথচ আসলে যা ঘটে, তা নিয়ে পেন্টাগণ মিথ্যাচার করে। ১৯৬২ সালে এত বেশি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র ছিল না— যা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আঘাত হানতে পারতো। অতএব, ক্রুশ্চেভ কিউবার কাছাকাছি মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন শুরু করেন। এই স্থাপন অধিক সংখ্যক আমেরিকান ঘাঁটি ও নগরী তার ধ্বংসকারী পাল্লার মধ্যে এসে যায়। কেনেডি এক মানসিক পীড়নের মধ্য দিয়ে এর জবাব দেন, অবরোধ করেন কিউবার চারদিক। প্রস্তুতি নেন সোভিয়েত মিসাইল বোঝাই জাহাজকে কিউবার জলসীমায় প্রবেশে বাধা দিতে। অবরোধ নিঃসংশয়ে যুদ্ধের সামিল।

আটলান্টিকে কিউবাগামী ক্ষেপণাস্ত্র বোঝাই সোভিয়েত জাহাজের পথরোধে আদেশ প্রাপ্ত আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের সংঘর্ষ ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি জাতীয় গোয়েন্দা দফতরের বিশ্লেষণ নিয়ে বসেন। বিশ্লেষণে সতর্ক করে দেয়া হয়, পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ। সারা বিশ্বে আমাদের সামরিক স্থাপনাগুলো সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে। ভূগর্ভে আমাদের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং সমুদ্র তলদেশে আমাদের পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হবার চূড়ান্ত মুহূর্তে রয়েছে। আমাদের বি—৫২ বোমারুগুলো পারমাণবিক বোমায় সজ্জিত হয়ে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে ওঠার জন্য সময় নষ্ট করার প্রয়োজন পড়বে না তাদের।

হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বুড়ো আঙ্গুলের চাপে মাথা মোটা একটি ক্ষুদ্র পেরেক বসিয়ে দিলেন আটলান্টিকের মানচিত্রের এক বিন্দুতে

এবং সোভিয়েত জাহাজকে ওই বিন্দুতে বাধা প্রদানের আদেশ দিলেন জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ প্রধানকে। সোভিয়েতরা অবরোধ বিন্দুকে উপেক্ষা করলে আস্তে ধীরে মানচিত্র থেকে পেরেকটি তুলে আনলেন প্রেসিডেন্ট এবং আরো পেছনে সরিয়ে এনে চেপে বসিয়ে দিলেন। 'ওদেরকে আরো কিছু সময় দেই আমরা' জয়েন্ট চীফস প্রধানকে বললেন, 'কিন্তু ওরা যখন এই বিন্দুতে পৌঁছবে, থামিয়ে দিতেই হবে।' পেরেক বসানো দ্বিতীয় বিন্দুর দিকে ক্ষেপণাস্ত্র বোঝাই জাহাজ এগোতে শুরু করলে মস্কো থেকে বেতারে আদেশ গেল। জাহাজ মুখ ঘোরালো এবং মস্কো অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। ডীন রাস্ক ছিলেন তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অধঃস্তনদের তিনি বললেন, 'আমরা চোখে চোখ রেখে স্থির ছিলাম এবং আমার মনে হয় অন্যরা পলক ফেলে। সংকটের পুরো সময়টা তথ্য বিভাগ সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং মিথ্যা চিত্র দেয়ার জন্যে যত্ন সহকারে তার সমন্বয় সাধন করা হয়। কিউবায় আক্রমণাত্মক অস্ত্র চিহ্নিত করা গেছে, সতর্কতার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে সকল শাখা-প্রশাখাকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে, এসব বিষয়ে পেন্টাগণ মুখপাত্রদের কাছ থেকে স্বীকৃতি মেলে নি। তিন মাস পর পেন্টাগণ তথ্য বিভাগ প্রধান আর্থার সিলভেসটার উচ্চ কণ্ঠে বলেন : 'কিউবা সংকটকালে প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে প্রচারিত কোন খবরের বিকৃতি হয় নি এবং উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেও কোন খবর প্রচারিত হয় নি।' এই বাক্যে সত্যের লেশ মাত্র ছিল না।

কিউবা সংকট মোকাবেলায় কেনেডির দক্ষতা রিচার্ড নিকসনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এক ভয়াবহ আণবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েও কেনেডি যে নির্বিকার সাহসের পরিচয় দেন, তিনি তার প্রশংসা করেন শ্রদ্ধাভরে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট নিকসন বঙ্গোপসাগরে নিজের আণবিক শক্তিমত্তা জাহিরের সুযোগ পান

আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে, নিরানন্দ এবং তীব্র যন্ত্রণা থেকে সৃষ্ট এক খণ্ড ভূমি, যা আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত, এই ভূখণ্ড নিয়ে যখন পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধে লিপ্ত, সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীন আদেশ জারি করে। পারমাণবিক বোমা সজ্জিত ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী সাড়া দেয়। ঘুরপথে পাকিস্তানিদের সরবরাহ পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ' এর নেতৃত্বে নৌবাহিনীর টাস্ক ফোর্স। ওয়াশিংটনের আদেশে জাহাজগুলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এটা প্রশিক্ষণ মহড়ার মতো ছিল না। তার চেয়ে অনেক বেশি।

সহিংসতার উপাদান

ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো টি. এগনিউ বোতামে টিপ দিলেন এবং পৃথিবীতে শান্তি কামনায় সঙ্গীত গীত হতে থাকলো। ছোট্ট এক জনতা এবং কিছু টুরিস্ট হোয়াইট হাউস ও ওয়াশিংটন স্মৃতি সৌধের মাঝামাঝি গাছগাছালিতে ঘেরা একটি গোলাকার চত্বরে জড় হয় জাতীয় ক্রিসমাস বৃক্ষ প্রজ্জ্বলনে। এ ছিল ওয়াশিংটন ব্যবসায়ীদের তথাকথিত ধর্ম-প্রসার বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের অংশ যা "প্যাজিয়েন্ট পিস" নামে অভিহিত।

পৃথিবীর অপর প্রান্তে রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে নিজেদেরকে বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায় নিক্ষেপে পরিচালিত করছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান প্রবেশে তারা তখন পক্ষ বাছাইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চৈনিকরা, যারা গোপনে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে হিমালয়েরর ওপর দিয়ে সরবরাহ পাঠাচ্ছিল, তারা সীমান্তের অপর পারে ভারতে সৈন্য প্রেরণ করা নিয়ে হিসেব কষছিল। হোয়াইট হাউস যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ সম্পর্কে প্রচারিত ভুল সংবাদের অপনোদন ঘটায় বটে; কিন্তু নৌবাহিনীর একটি টাস্ক ফোর্স পাঠায় বঙ্গোপসাগরে।

পদস্থ সোভিয়েত কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, চৈনিক হস্তক্ষেপের সমতা বিধান করা হবে চীনা ভূখণ্ডের ওপর রুশি আক্রমণ পরিচালনার মধ্য দিয়ে এবং আমেরিকান টাস্ক ফোর্সের যে কোন পদক্ষেপকে বাধা দেবে রুশ নৌবহর। মুখোমুখি তিক্ত বিতর্কে এক রুশ অফিসার তার চৈনিক প্রতিপক্ষকে রুশি ক্ষেপনাস্ত্রের শক্তিমত্তা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেন। সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে এবং সেকেলে কায়দায় ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এই তথ্য সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনে পাঠায়।

বিপদ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না করে কংগ্রেস এবং সংবাদ মাধ্যমকে আশ্বাস দেয়া হয় যে, আমেরিকা কঠোরতার সাথে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। প্রেসিডেন্ট নিকসন ব্যক্তিগতভাবে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের বড় বড় নেতাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, তার লক্ষ্য শান্তি স্থাপন করা। তিনি বলেন, 'আমরা নিরপেক্ষ, আমরা কোন পক্ষ নিচ্ছি না।' নিকসনের বিদেশ নীতির

উপদেষ্টা ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জার সাংবাদিকদের সামনে জোর দিয়ে বলেন, ভারতের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপতার খবর 'বেঠিক।'

অন্যদিকে দু'জনেই— নিকসন ও কিসিঞ্জার, গোপনে যেসব নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তাকে কদাচিৎ নিরপেক্ষ বলা যায়। এমন কী, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হবার আগে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিজের অফিসে ডেকে পাঠান এবং পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদানের পথ খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্যদের নাম ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ— ওয়াসাগ, যা জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের জন্য সংকট ত্রাতা। এই পর্ষদ জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৬৯ সালে উত্তর কোরিয়া একটি মার্কিন পর্যবেক্ষণ বিমান গুলি করে ভূপাতিত করলে নিকসন ও কিসিঞ্জার ওয়াসাগ সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তীকালে জরুরি মোকাবেলায় তারা একে ব্যবহার করেন।

ভারত-পাকিস্তান সংকটে ওয়াসাগ ঘন ঘন বৈঠক করে। কিসিঞ্জার ছিলেন চেয়ারম্যান এবং এর বৈঠকে পাকিস্তানের অনুকূলে "ঝোঁকার" নিকসনের সংকল্পের কথা সদস্যদের অনবরত স্মরণ করিয়ে দেন। যেসব কূটনীতিক যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত নিরপেক্ষ নীতি লংঘনে দ্বিধা করতেন, তাদেরকে তিনি ভৎর্সনা করতেন। সদস্যদের প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা অনুসরণে উপদেশ দিতেন। কিসিঞ্জারের ভারত বিরোধী মনোভাব তার কয়েকজন অধঃস্তনকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে। "কখনো কখনো কিসিঞ্জার ক্ষ্যাপার মতন আচরণ করতেন," কিসিঞ্জারের স্টাফদের একজন আমাকে বলেন, "ভারতের প্রতি তার বিদ্বেষকে বিচার শক্তি বিবর্জিত বলে মনে হতো।" ঘটনা অশুভ দিকে মোড় নেয়ার সাথে সাথেই আমার সূত্র আমাকে তথ্য সরবরাহ করে যেতে থাকে।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রত্যেক প্রেসিডেন্টেরই আছে। কিন্তু এই অধিকার তাকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমেরিকান জনগণের সঙ্গে প্রতারণার অনুমোদন দেয় না। এই বিশ্বাস যখন আমার ভেতর জন্ম নেয় যে, যুক্তরাষ্ট্রকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে তখন আমি আমার খবরের সোর্সদের প্রামাণিক তথ্য দিতে বলি, যা জনসাধারণের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম হবে। আমি আমার সোর্সের সঙ্গে জনবহুল এলাকায় দেখা করার ব্যবস্থা করি। সেখানে সহজেই সকল দৃষ্টির আড়ালে বাদামী রঙের ম্যানিলা খামে ভরা দলিল সে আমার হাতে তুলে দিতে পারবে। সোর্স ডজন খানেক দলিল গুছিয়ে আনে। সেগুলো এত বেশি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী যে, অপ্রাসঙ্গিকভাবে কোন কিছু এসে গেছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে আমি আরো দলিল দেবার জন্যে বলি। এবং নিঃসংশয় হই কয়েকশত সহায়ক দলিল বিশ্লেষণে গিয়ে।

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমি রণক্ষেত্রে মার্কিন টাস্ক ফোর্স প্রেরণের সংকেতটি আবিষ্কার করে ফেলি। আমার মনে হলো, বঙ্গোপসাগরে রুশ এবং মার্কিন

নৌশক্তির অবস্থান থেকে সৃষ্ট স্ফুলিঙ্গ পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে। আমার সোর্সের একজন পূর্বে ব্যবস্থাকৃত টেলিফোন সংকেতের মাধ্যমে জানালো, হোয়াইট হাউসের দুটি ব্লক ছাড়িয়ে একটি মনোহারী দোকানে তার সঙ্গে দেখা করতে। দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে তিনি এমন ভাণ করছিলেন যেন তিনি বড় দিনের কেনাকাটায় ব্যস্ত। কোন ভূমিকা ছাড়াই ফিসফিসিয়ে বললেন বঙ্গোপসাগরে নৌবহর প্রেরণের পরিকল্পনাটি প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করেছেন। মনোহারী দোকান থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হওয়ার গোপন ব্যাপারটি নিয়ে আমার প্রথম রিপোর্টটি তৈরি করে ফেললাম।

আমার সোর্সকে নিরাপত্তা দানের জন্য আমি গোপন দলিল থেকে উদ্বৃতি দেই। পরিকল্পনার এই সীমিত প্রকাশ হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরের ক্রোধের ধরনটা ছিল এইরকম— আমি যেন দলিলের ব্যাপক অংশ তুলে দিয়েছি। কিসিঞ্জার আমার তথ্য নাকচ করতে চাইলেন এই বলে যে, আমি খবরের উদ্ধৃতিতে তাকে এনেছি অপ্রাসঙ্গিকভাবে। আমি তখন আমার লেখার সমর্থনে প্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ থেকে দলিলপত্রের বেশির ভাগই নিজের কাছে রেখেছিলাম। এখন যাতে প্রকাশ করা যায়, সে জন্য বিস্তারিত জানতে দলিলগুলো আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম এবং কিভাবে নিকসন প্রশাসনের বৈদেশিক নীতি প্রণীত ও সম্পাদিত হয়, কিভাবে জনগণকে বিপথে চালিত করা হয়, সেটা তুলে ধরা যেতে পারে বলে মনে করলাম।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে পশ্চাৎপট। যখন নিকসন চিয়াংকাইশেকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কমিউনিস্ট চীনের ঘোরতর শত্রু, নিজের রাজনৈতিক জীবনের সেই আরম্ভকালের একটি ভুলের অপনোদন ঘটাতে চেয়েছিলেন। ওই সময় মাওসেতুং ও চৌ এন লাই চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু তার বিরামহীন কমিউনিস্ট বিরোধী চিৎকার সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে। আর চীন ও আমেরিকার এই শত্রুতার পরিণতিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া মহাদেশের দু'দুটো ব্যয়বহুল যুদ্ধে নিক্ষেপ করে। পঁচিশ বছর পর, যদিও খুবই দেরীতে নেয়া হয়, নিকসন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, চীন ও আমেরিকার মধ্যে শত্রুতা ছিল একটি ভয়ংকর ধরনের ভুল। এবং তিনি পিকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে রওনা হলেন।

এই অভিযাত্রা তাকে পাকিস্তানের একনায়ক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছাকাছি নিয়ে আসে, যিনি তার জন্যে পিকিংয়ের দরোজা খুলে দেওয়াতে সহায়তা করেন। এবং দুই নেতার মধ্যে উষ্ণ বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পাকিস্তানকে তার সাহায্যের সিদ্ধান্তটি ছিল একটি জাতীয় ট্রাজেডি; সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে আমেরিকার ঐতিহাসিক অঙ্গীকারের বিলোপ সাধন। অধিকন্তু ভারত বিরোধী নীতি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। যুদ্ধ শুরু হবার চার মাস আগে, ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে নিকসন তার বৈদেশিক নীতি প্রণেতাদের বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সংঘর্ষে তিনি তাকেই (ইয়াহিয়াকেই) সমর্থন দিতে চান।

পৃথিবীতে বাংলা নামের এই এক খণ্ড ভূমির অপব্যবহার করেছে মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ এবং মৃত্যু সেখানে গতানুগতিক জীবনের অংশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই উর্বর পাললিক ভূমির অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে হিন্দু এবং মুসলমানরা। সম্ভবত স্বাধীনতার জন্য বাঙালির লড়াই ছিল অনিবার্য। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাংলা। আয়তনে যা আমেরিকার লুইজিয়ানা অঙ্গ রাজ্যের সমান এবং কিছুটা একই পরিমাণ ব-দ্বীপ আকারের। বিচ্ছিন্ন ছিল নতুন রাজধানী ইসলামাবাদের সরকার থেকে, বিচ্ছিন্ন ছিল দূরত্বে, সংস্কৃতি ও ভাষাগত ক্ষেত্রে।

কেবল একজন কবিই পারেন ভৌগলিকভাবে এই আলাদা দু'টুকরোর রাজনৈতিক ঐক্য কল্পনা করতে। এর মাঝ বরাবর রয়েছে ভারত। একে অপরকে বিভক্ত করছে হাজার মাইলের অধিক দূরত্ব। যে কবি রাজনৈতিক ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার নাম মোহাম্মদ ইকবাল। ১৯৩০ সালে ভারতে হিন্দু আধিপত্যহীন একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন তিনি। এমন কী, যে সময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের সম্পদ বাইরে চালান করতে থাকে তখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের থেকে মানগত দিক দিয়ে ভাল অবস্থানে ছিল।

"পাকিস্তান" শব্দটি একটি আবিষ্কার। পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও সিন্ধু ভারতের এই চারটি মুসলিম প্রধান অঞ্চলের নামের আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে সৃষ্টি। ১৯৩৫ সালে ইংল্যান্ডে মুসলিম ছাত্ররা চয়ন করে এই শব্দটি।

১৯৪৭ সালে এই নামের একটি ভূখণ্ডের জন্ম হয়ে যায়। ভারতীয় স্বাধীনতায় মুসলমানরা একটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্য ভোট দেয়। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান একটি একক জাতিতে পরিণত হয়। মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাতে প্রাণহানি ঘটে লাখ লাখ মানুষের এবং শুরু হয় জন্মভূমি ত্যাগের প্রবাহ। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, যারা সংখ্যায় জাতির অর্ধেকের বেশি, শুরুতেই নিষ্ঠুর আচরণের মুখোমুখি হয়। দেশের নামের বানানেই তারা শুধু উপেক্ষিতই হয় না,— নতুন সরকারের কার্যক্রমে তাদের তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। পাকিস্তানের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো ' বাইশটি পরিবার' এবং তারা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। তাদের জীবন-যাপন প্রণালী ছিল বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিদের মতোই। অন্যদিকে ক্ষুধা ছিল অধিকাংশ পাকিস্তানির সঙ্গী। রাজনৈতিক শক্তিও কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিমে, যার প্রথম রাজধানী ছিল করাচি। পরে রাওয়ালপিন্ডিতে,— নতুন রাজধানী ইসলামাবাদ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত। অন্যপক্ষে ভারত নিজেকে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তুলে ধরার পথে চালিত করে। আর পাকিস্তান পড়ে একনায়কতন্ত্রের কবলে।

বাঙালিরা অবশ্য নতুন জাতির জীবনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। সমগ্র দেশের শতকরা ১৫ ভাগ ভূখণ্ডের অধিকারী হয়েও জাতির বৈদেশিক মুদ্রার অর্ধেকেরই উৎপাদক ছিল তারই। বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল সমতল, বেশিরভাগ জলাভূমি বেষ্টিত সমতল। যন্ত্রণাদায়ক ভাবে চেপে বসে আদ্রতা। মৌসমী বৃষ্টির তোড়

প্রবল। ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপও প্রচণ্ড। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত ছুটে আসা মেঘমালা পূর্বদিকের পর্বতগাত্রে বাধা পায়। সৃষ্টি হয় আকাশ জোড়া মেঘপুঞ্জ। সেই মেঘ বৃষ্টি ঝরায় ক্লান্তিকর নিরবিচ্ছিন্নতায়। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় বাংলার বেশির ভাগ এলাকা থাকে পানির নিচে।

একটি উর্বর দেশ জন্মহার আশ্চর্য রকম ভাবে বেশি। যুবক এবং বৃদ্ধ একত্রে মাঠে কাজ করে আরেকটি জীবনের জন্ম দানের জন্য। বিশ্বের শতকরা আশিভাগ পাট উৎপাদিত হয় বাংলায়; স্বর্ণালী ফুলের এ ধরনের উদ্ভিদ, যা দিয়ে মোটা কাপড়ের তন্তু এবং দড়ি তৈরি হয়। স্বাধীনতার চব্বিশ বছরেও বাংলায় পাট প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে তোলায় পাকিস্তান খুব বেশি কিছু করে নি। অথচ বাংলার পাট এবং পাটজাত পণ্য রফতানি থেকেই আসে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় নগদ বৈদেশিক মুদ্রা।

এই অর্থের সামান্যই গেছে বাংলার অর্থনীতির জন্য। অন্যদিকে সরকার ইসলামাবাদে তৈরি করে চোখ জলসানো নতুন রাজধানী। আর ২২ পরিবার শখের প্রিপারেটরি স্কুল, জমকালো পার্টি এবং স্বতন্ত্র ক্লাব তৈরি করে বৃটিশের হীন অনুকরণে থাকে ব্যস্ত। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন ছিল রূঢ়, কষ্টদায়ক এবং নিপীড়নকর। যদিও ব্যবসাবাণিজ্য ঢাকাকে একটি আধুনিক শহরের অবয়ব এনে দেয়, মৎস্য বন্দর চট্টগ্রামকে পাট-বাণিজ্য পরিচালনার জন্যে একটি সমুদ্রগামী জাহাজের, পোতাশ্রয় হিসেবে গড়ে তোলা হয় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকা উন্নয়নের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে। সেই সময়ের পাঁচজনের একজন পূর্ব পাকিস্তানি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং অধিকাংশের জন্য জীবন কঠোর শ্রমের। মৃত্যু দ্রুত পায়ে আসে এগিয়ে।

যে বৃষ্টি ভূমিকে উর্বর করে সেটাই আবার কলেরা, গুটি বসন্ত, যক্ষা এবং ম্যালেরিয়ার জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। বৃষ্টি যখন প্রবলতর হয়ে ওঠে, বন্যা তখন আরো জীবনহানি ঘটায়। ১৯৬৬ সালে একটি ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তের বৌদ্ধ বসতি বহুল শহর কক্সবাজারে আঘাত হানে এবং দশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটায়। এই ধরনের বিপর্যয় প্রায় রুটিন মাফিক ব্যাপার। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে একটি ঘূর্নি হাওয়া বামাবর্তে বাঁক নিয়ে গঙ্গা নদীর মোহনা বরাবর বদ্বীপের ওপর পাক খায়। ওই ঘূর্নিঝড় আড়াই লাখেরও বেশি মানুষের জীবন ছিনিয়ে নেয়। যারা বেঁচে ছিল, তাদের জন্য জীবন ভীতিকর হয়ে ওঠে। ধান কাটার সময় হয়ে এসেছিল। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় তা। যে ভূখণ্ড বিপর্যয়ে অভ্যস্ত সেখানে দুর্ভিক্ষ সহ্যের অতীত এক ভয়াবহতা।

শোক ক্রোধে রূপান্তরিত হয়,— ক্রোধ লড়াইতে। কৃষকরা কাদা মাটি থেকে মৃতদেহ তুলে এনে গর্তে পুঁতছে, অথচ সরকার তাদের সাহায্যের জন্য আগ্রহ দেখায় না। ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া খান, যিনি সেনাবাহিনীর শক্তির বদৌলতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাসন করছিলেন, বললেন, বাঙালিদের খাওয়ানো এবং পুর্নবাসনে সাহায্য করার মতো অর্থ তার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নেই। কিন্তু

ইসলামাবাদের মনোরম সবুজ উপত্যকায় প্রাসাদোপম সরকারি ভবনের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার মতো অর্থের ঘাটতি ছিল না।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানিরা জাতির ইতিহাসে জাতীয় পরিষদ গঠনে সর্বপ্রথম মুক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অসাধারণ ঐকমত্যে বাঙালিরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিবের দল পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের দুটি বাদে সব গুলোতেই বিজয়ী হয়ে নতুন জাতীয় পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবারের নেতারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। জাতির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এই প্রথমবারের মতো এমন একটি সংস্কারকামী দল হুমকির সম্মুখীন করে, যে দল দেশের কুড়িটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে সর্ববৃহৎ হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাদের বিপুল ধনসম্পদ বিপত্তির মুখে পড়ে। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হয়ে দেশ শাসন করতেন ইয়াহিয়া এবং তিনি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। বাঙালিরা নম্র কিন্তু আবেগ প্রবণ। তাদের দুর্বার আইন অমান্য আচরণ বৃটিশের পতন ডেকে আনে। পাকিস্তানিদের প্রতিও তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। অতএব, ক্রুদ্ধ বাঙালিরা আবার পথে নামে। দাবি তোলে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার।

বাঙালিরা আগাগোড়াই কৃষিজীবী। আর লম্বা, হালকা দেহের ও ফরসা ত্বকের অধিকারী পাঞ্জাবিরা ছিল বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক। পরবর্তীকালে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ দখল করে।

২৫ মার্চ পাঞ্জাবি সৈনিকরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে, বাড়িঘরে গোলাবর্ষণ করে, ছাত্রাবাসগুলোয় হামলা চালিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং নিষ্ঠুরভাবে অভ্যুত্থান দমন করে। ইসলামাবাদের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে চালান দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের একটি জেলে। অন্যান্য আওয়ামী লীগ সদস্যদের হয় গ্রেফতার নতুবা হত্যা করা হয়। নিপীড়ন কোন পরিবর্তন আনে না। বাঙালি যুবক-তরুণরা নিজেদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করে পাল্টা আঘাত হানে। সেনাবাহিনী শুরু করে গণহত্যা; যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কদাচ মেলে। দশ লাখ সম্ভবত বিশ লাখ, কেউ-ই নিশ্চিত জানবে না কত বাঙালি প্রাণ হারায়। হাজার হাজার সম্ভবত লাখ লাখ নারী এবং তরুণী হয় ধর্ষিতা। বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং লুটপাট করা সেনাবাহিনীর জীবন ধারায় পরিণত হয়। নিরীহ শরণার্থীরা দলে দলে ভারতে এসে জড় হতে থাকে।

'যুক্তরাষ্ট্র এই সামরিক সংঘাতকে সমর্থন দেয় নি কিংবা ক্ষমাও করে নি।' প্রেসিডেন্ট নিকসন এ কথা বলেন ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসে দেয়া তার স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট-এ। এটা আংশিক সত্য। ঘটনা হচ্ছে এই, — যুক্তরাষ্ট্র এই সংঘাত বন্ধ করতে কিছুই করে নি বরং বৈদেশিক সার্ভিসের যে সব অফিসার বাংলার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা হয়।

বাঙালি হত্যাযজ্ঞ যখন শুরু হয় তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে, ব্লাড বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠান ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের কাছে; ওয়াশিংটনে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়েও। আমেরিকার স্পষ্ট উদাসীনতার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি দরখাস্তে সই করেন কনসুলেটে তার অধঃস্তন কর্মীরা। তিনি সেই দরখাস্তও পাঠিয়ে দেন বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে।

ঢাকা কনসুলেটের কিছু কর্মীকে, যারা দরখাস্তে সই করেছিলেন, তাদেরকে ডেকে পাঠানো হয়। সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন কূটনীতিকদের পত্নীদের ঢাকা থেকে ইসলামাবাদে সরিয়ে নেয়া হয়। তারা বলেছিলেন, যে ভয়াবহতা তারা দেখেছেন, তা শুধু কল্পনাতেই আসতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমন বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল তাদের।

ব্লাডকে ১৯৭১ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠানো হয়। ঢাকায় ফেরার পরিকল্পনা ছিল তার। আঠারো মাস বাকি ছিল ঢাকার চাকুরির মেয়াদ পুরো হতে। পুরো আঠারো মাসই তিনি চেয়েছিলেন ঢাকায় কাটাতে। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি আতংক ছড়িয়ে বেড়ানো ব্যক্তি এবং প্রশাসন বিভাগের একটি টেবিলে তাকে বসিয়ে দেয়া হয়। এই অবমাননা সত্ত্বেও পদস্থদের প্রতারণার মুখে যে সাহস ও সততা তিনি দেখান, তা বিদেশ দপ্তরের অনেক অফিসারের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

যুদ্ধের পায়তারা

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ছিলেন কাল বিরুদ্ধ ব্যক্তি; রুডিয়ার্ড কিপলিং ধাঁচের আত্ম-অহংকার সর্বস্ব অফিসার। যুদ্ধ-ময়দানে তেজস্বী, মদ্যপানে আকণ্ঠ, নিজের স্খলন সম্পর্কে উদাসীন এবং ষড়যন্ত্র পাকানোতে ছিলেন পরম দক্ষ। কিন্তু রাজনীতির কূটকৌশল সম্পর্কিত বিষয়ে ছিলেন একেবারেই অক্ষর জ্ঞান শূন্য।

বংশগত ধারায় ছিলেন সৈনিক। একটি জাত সামরিক পরিবারে তার জন্ম। তার পারসিক পূর্বসূরীরা অষ্টাদশ শতকে দিল্লী জয় করেন।

মানসিক দিক দিয়েও তিনি ছিলেন সামরিক আচার-আচরণপুষ্ট। যেখানেই যেতেন, যে পোশাকই তিনি পরতেন, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে বগলে রাখতেন একখানা ছড়ি।

শিক্ষায় ছিলেন সৈনিক। যুদ্ধবিদ্যা শেখেন ভারতে বৃটিশ উপনিবেশিক সামরিক অ্যাকাডেমিসহ সামরিক স্কুলে। ড্রিলের মাঠে ছিলেন দীর্ঘকায় এবং নেতৃত্ব দিতেন ক্লাশে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ অফিসারের উর্দি চাপান দেহে। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভক্তির পর ফিরে আসেন স্বদেশে এবং পাকিস্তানের নতুন স্টাফ কলেজের প্রধান হন। সেনাবাহিনীতে সামনে এগোতে হয় কিভাবে, কী করলে ওপরে ওঠা যায়, এর ওপর ছাত্রদের তিনি একটি ব্যবহারিক কোর্সে প্রশিক্ষণ দেন। ৩৪ বছর বয়সে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার, ৪০-এ হন জেনারেল, কমান্ডার ইন-চীফ হন ৪৯ বছর বয়সে। ওপরে ওঠার প্রক্রিয়ায় ইয়াহিয়া খান জেনারেল আইউব খানের বন্ধু হয়ে ওঠেন। ১৯৫৮ সালে আইউব খান যে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হন, তার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। এই বন্ধুত্ব এবং ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তার যোগ্যতা তাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানে ভূষিত করে।

প্রশিক্ষণ ও বীরত্ব কোনটাই তাকে বেসামরিক নেতৃত্বের জন্যে তৈরি করে নি। ১৯৬৯ সালের আইউবের জায়গায় প্রেসিডেন্ট হন কিন্তু ওই পদে ছিলেন বেমানান। ইয়াহিয়া কিছু সংস্কারমূলক কাজ করেন। গণতান্ত্রিক বেসামরিক

সরকার প্রতিষ্ঠারও অঙ্গীকার করেন। কারাগারে ঢোকানোর আগে তিনি মুজিবুর রহমানকে নির্বাচনে বিজয়ী হবার সুযোগ দেন,যা ছিল অঙ্গীকার পূরণের কাছাকাছি।

আভ্যন্তরীণ অশান্ত পরিস্থিতি থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখেন। বিচ্ছিন্ন থাকেন ইসলামাবাদের প্রেসিডেন্ট ভবনের মাঝে নিজেকে আড়াল রেখে। গর্ব করে তিনি বলতেন, প্রতিদিন সকালে তিনি এক বোতল স্কচ শেষ করেন এবং এই পান তার প্রশাসনিক কাজ কর্ম কিংবা যৌন ক্ষমতায় সমস্যা সৃষ্টি করে না। যখন তার দেশ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যেতে থাকে, তিনি তখন ব্যাপক সাদৃশ্যহীন দুটি দেশ কমিউনিস্ট চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের মাঝে স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন।

দুই বৃহৎ শক্তি পাকিস্তানকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। চীনের সঙ্গে বিরোধ ছিল ভারতের। তাই নিজের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বভাগে সে একজন মিত্র পেতে আগ্রহী ছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান যখন কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়, সে সময় সে চীনের সিয়ানকিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত নিজের সীমান্ত প্রসারিত করে। একটি প্রাচীন বাণিজ্যিক কাফেলা সড়ক গেছে সর্পিলভাবে এই সীমান্তের ওপর দিয়ে। পরবর্তীকালে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সকল আবহাওয়া উপযোগী করে প্রশস্ত ও পোক্ত করা হয়। এই সড়ক সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়, মোটরগাড়ির কাফেলা এই পাহাড়ি পথ দিয়ে চলাচল করে। পাকিস্তানে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যায়।

অস্ত্রের বিনিময়ে চীনকে পাকিস্তান সরকারের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়। যখন আলী ভুট্টোকে ইয়াহিয়া তার আপাতকালে বেসামরিক সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে তখন সেটা ছিল পাকিস্তানের পিকিংপন্থীদের হস্ত বোলানোর সামিল।

আমেরিকানরা পাকিস্তানকে নির্বীর্য দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তিতে ঢোকায়। স্নায়ু যুদ্ধ থেকে পাওয়া অন্যান্য বিষয়ের মতোই সিয়াটো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক স্রোতের সাথে মিশে গিয়ে ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিজের লাভজনক দিকটি সম্পন্ন করেন। আমেরিকান ও চৈনিকদের একত্র করতে তিনি রাজনৈতিক দালালিতে নামেন। হোয়াইট হাউসের উপদেশক ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জারকে সাহায্য করেন এবং প্রফেসরের গোপন পিকিং সফরের সময় তাকে গোপনীয়তার আড়াল দেন। এমন কী, যেদিন কিসিঞ্জারের যাওয়ার কথা, তার আগের রাতে ইয়াহিয়া তার সম্মানে একটি নারী বর্জিত ভোজের আয়োজন করেন।

কিসিঞ্জারকে দেয়া ইয়াহিয়ার আনুকূল্য প্রেসিডেন্ট নিকসনকে এই একনায়কের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। আর প্রতিদানে তিনি (নিকসন) তাকে যে কোন রাজনৈতিক সুবিধা, তার মূল্য যতই হোক, দিতে দ্বিধা করেন নি।

ইয়াহিয়ার বন্ধুত্বের মূল্য দিতে গিয়ে নিকসন বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অন্যান্য আমেরিকান নেতাদের মতোই প্রেসিডেন্ট ভারতের ওপর ক্ষেপে যান যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে তার অনবরত বিভিন্ন বিরক্তিকর উক্তিতে। উপরন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ওপর নিকসন ছিলেন ক্ষুব্ধ। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী দক্ষ রাজনীতিক। আমাদের সূত্র জানায়, দিল্লী ও ওয়াশিংটনে দু'জনের একান্ত বৈঠকে তিনি তাকে (নিকসনকে) নাকানি-চোবানি খাইয়েছিলেন। নারীকে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে নিকসনের জন্য ছিল সমস্যা পীড়িত বিষয়। এর ওপর বিদেশি-নেতাদের ব্যাপারে ছিল তার উন্মাসিকতা। আর ওই বিদেশি নেতা যদি হন তার চেয়েও কুশলী, সেটা আরো সমস্যাজনক। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী একজন নেতা ও একজন নারী হিসেবে ক্ষেপিয়ে দেন নিকসনকে।

সম্ভবত উনিশ শতকে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমার মেটারনিক প্রচারিত ক্ষমতার ভারসাম্য মতবাদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিকসনের কাছে। এই মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করেন তার রাজকুমার মেটারনিক হেনরি কিসিঞ্জার। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মর্যাদার পরিবর্তন অঞ্চলটির ভারসাম্য বিনষ্ট করবে এবং দেশটিকে মার্কিন পক্ষ থেকে সরিয়ে দেবে। কিসিঞ্জার ও নিকসন এটা অনুধাবন করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন তারা সেটা ঘটাতে দেবেন না।

শুরু থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মার্কিন জনগণ পূর্ব পাকিস্তান লুণ্ঠনে ইয়াহিয়াকে আমেরিকার সাহায্য প্রদান সহ্য করবে না। হত্যাযজ্ঞ যখন আরম্ভ হয়, কংগ্রেস হোয়াইট হাউসকে বাধ্য করে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করতে। অস্ত্র যাবার কথা ছিল জাহাজযোগে। মার্কিন জনগণের সহানুভূতি ছিল বাঙালিদের পক্ষে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেলে আমেরিকান জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরপেক্ষ অবস্থানে চলে যায়। ইয়াহিয়ার খুনি বাহিনীর জন্য অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখতে নিকসন তাই বার বার এবং সচেতনভাবে কংগ্রেস ও আমেরিকান জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করতে বাধ্য হন।

নিকসন তার স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ভাষণে যার নামকরণটি ছিল অদ্ভুত ধরনের 'বিকাশমান শান্তির কাঠামো' তাতে তিনি বলেন, 'এপ্রিলের গোড়াতেই আমরা পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ এবং লাইসেন্স নবায়ন থেকে বিরত থাকি। পূর্ববর্তী বছরে যে অস্ত্র দেবার অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম, সে চালানও আমরা বন্ধ করে দেই। আমরা উন্নয়নমূলক নতুন ঋণ প্রদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া থেকেও বিরত থাকি। এই নিবৃত্তিতে ৩৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র, ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খুচরো যন্ত্রাংশ, যা নভেম্বরের শুরুতে জাহাজে তোলা হতে থাকে এবং সেটা আগের লাইসেন্সের আওতায় চালান হবার পথে ছিল, তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।'

অথচ ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি (ম্যাসাচুসেটস-এর ডেমোক্রাট সিনেটর) পরিচালিত এক তদন্তে প্রমাণিত হয় যে,

যুক্তরাষ্ট্র জুন মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে চেয়েছিল। এছাড়া ডিসেম্বর যুদ্ধের সময় আরো আমেরিকান অস্ত্র পাকিস্তানকে দেয়া হয়।

ভারত-পাকিস্তান খোলাখুলি সংঘর্ষ শুরুর প্রথম গুলিটি বাদামী রঙের ধুলো এবং রণক্ষেত্রের সবুজ বনানীর মাঝে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বলতে হয় নিশ্চয়তার সাথে যে, যুদ্ধ আসলে শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যখন ইয়াহিয়া তার সেনাবাহিনীকে সন্ত্রাস সৃষ্টির আদেশ দেন। যখন সীমান্তে গণহত্যা সংঘটিত হতে থাকে, কোন জাতিই তখন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। উপরন্তু উৎপীড়ন ভারতে বন্যার মতো শরনার্থী ঠেলে দেয়। ডিসেম্বরের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের ১ কোটি মানুষ দারিদ্র্য আর ক্ষুধা নিয়ে জড় হয় হাজার হাজার শরণার্থী ক্যাম্পে।

এক অর্থে এটা ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের সামিল। কারণ, দেশটিকে আশ্রয় দিতে হয় লাখ লাখ ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা মানব সন্তানকে, যারা আশ্রয়চ্যুত হয়েছে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিবেকহীন আচরণে। এটা ভারতের ওপর একটি অতিরিক্ত বোঝা। কেননা, এমনিতেই সে তার নিজের লাখ লাখ ক্ষুধার্ত মানুষের খাবার জোগাড়ে ছিল প্রচণ্ড চাপের মধ্যে।

এক সিআই এ রিপোর্টে বলা হয়, 'বিপ্লব প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।' একই সময়ে ইয়াহিয়া ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তান তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর হোয়াইট হাউস বলতে থাকে যে, একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। ' সে সময় মাত্র একটি সেক্টরেই মুক্তিবাহিনীর (বাঙালি স্বাধীনতা যোদ্ধা) ছিল দশ হাজার সশস্ত্র সদস্য। আরো পাঁচ হাজার ছিল প্রশিক্ষণরত। 'যুব ক্যাম্পগুলো' সর্বক্ষণই ছিল তরুণের ভীড়ে ভারাক্রান্ত। সাধারণত কয়েকশ' নতুন সর্বদাই অপেক্ষায় থাকতো ভর্তি হবার জন্য।' সিআই এ— এর এই রিপোর্টের সাথে আরো বলা হয়, বিদ্রোহীরা, 'পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকা দখলে রেখেছে। সেগুলোকে মুক্তিবাহিনী মুক্তাঞ্চল বলে মনে করে...' প্রধান মুক্তাঞ্চলটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। চার হাজার লোক আছে এর প্রতিরক্ষায়। এদের কাছে আছে রকেট লঞ্চার, রিকয়েলেস রাইফেল, হাল্কা এবং ভারী মেশিনগান ও দুটো বিমান বিধ্বংসী কামান। ভারতীয় সেনাবাহিনী কাছাকাছি সীমান্ত এলাকা থেকে এদেরকে গোলন্দাজ সহায়তা দেয়।... কারণ, কঠিন প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত নেতৃত্ব এবং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পরিচালিত আক্রমণের সাফল্যজনক রেকর্ড এদের রয়েছে। এবং এই সেক্টরে ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে প্রায় সবক'টি অপরাশেন ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি সহায়তা ছাড়াই মুক্তিবাহিনী এককভাবে পরিচালিত করেছে।'

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহের আরম্ভতে সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানি ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং পাকিস্তানি অবস্থানে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনা সীমান্ত অতিক্রম করে। ভারতীয়রা অভিযোগ তোলে যে, তাদের সীমান্ত অভ্যন্তরে পাকিস্তানিরা গোলাবর্ষণ করছিল। তথাপি দুটো দেশই বাহ্যিকভাবে শান্তির নমুনা বজায় রেখেছিল।

২ ডিসেম্বরের শেষ বিকেলে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রতীক সম্বলিত তিনটি মার্কিন স্যাবর জেট পূর্ব সীমান্তবর্তী ভারতীয় শহর আগরতলায় বোমাবর্ষণ করে। এটাই ছিল দু'পক্ষের ভেতর প্রথম বেসামরিক লক্ষ্য বস্তুতে বিমান হামলা। কিন্তু ভারতীয় এবং পাকিস্তানিরা তখনও পর্যন্ত বাহ্যিক শান্তির খোলস ঝুলিয়ে রাখে। পরদনি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী আবার আক্রমণ হানে। এবার হামলা চালায় আটটা বিমান ঘাঁটিতে। বিস্ময়ের ঘোর কাটে। প্রথমে বিমান আক্রমণ সতর্কীকরণ সাইরেনকে মনে করা হয় অনুশীলনী সতর্কীকরণ সাইরেন। প্রাথমিক ভারতীয় রিপোর্টে তিন জায়গায় বোমা বর্ষণের কথা বলা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি বেতার ঘোষণায় আরো অধিক জায়গার নাম যুক্ত করা হয়। আক্রমণের সময় মিসেস গান্ধী কোলকাতায় পাচ লাখ লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতা মঞ্চ ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত তিনি আক্রমণের খবর জানতে পান নি।

হামলা শুরুর চার ঘণ্টা পর বৈঠক করে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ। সিআইএ'র পরিচালক রিচার্ড হেলমস স্বীকার করেন যে, তিনি বিভ্রান্তিতে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, 'পরস্পর বিরোধী খবর আসে দু'পক্ষ থেকে। অমৃতসর পাঠানকোর্ট এবং শ্রীনগর বিমান ঘাটির ওপর পাকিস্তানি বিমান হামলার খবরটি অভিন্ন ছিল।'

ইয়াহিয়া এই হামলাকে ইসরাইলী কায়দায় নিপুণ আঘাত হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় বিমান শক্তিকে অচল করে দেয়া। কিন্তু এ সম্পর্কে সমর বিশেষজ্ঞরা তার এই কাঁচা কাজে আতংকিত হয়ে ওঠেন। পেন্টাগণ জানতো এই ঘাটিগুলোতে নগণ্য সংখ্যক বিমান রেখেছে ভারতীয়রা।

জয়েন্ট চীফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল টমাস মুরার এই পাকিস্তানি হামলার কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। তিনি বলেন 'এই হামলা হতবুদ্ধিকর করে এই কারণে যে, এমন তিনটি ছোট্ট বিমান ঘাঁটিতে আঘাত হানে পাকিস্তান যেখানে ভারতীয়রা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিমান রাখে নি। পাকিস্তানি এই হামলার প্রশংসা করা যায় না। আর তা চালানো হয় শেষ বিকেলে, যা বাস্তবতা বোধের পরিচায়ক নয়।'

মুরার আর তার ছোট্ট কক্ষে বসে থাকা প্রত্যেকেই জানতেন ওয়াসাগ (ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ) সদস্যদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার পাশে আসল ঘটনার কোন গুরুত্ব নেই। তাদের কাজ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা নয়, তাদের কাজ হচ্ছে চার মাস আগে গ্রুপ সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতায় পাকিস্তানপন্থি যে কূটনীতি অনুমোদন করেন, তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা।

একনায়ক ও কূটনৈতিক

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের এক অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রায় প্রতিদিনই তারা মিলিত হতেন এবং কোন কোন দিন স্কচ হুইস্কির স্বাদ নিতেন। এই যোগাযোগ পাকিস্তানি একনায়ককে তার প্রতি নিকসনের সমর্থনের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেয়। ইসলামাবাদে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতরা অভিযোগ করেন যে, ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফারল্যান্ড ছাড়া আর কোন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেননি।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভবনা যখন অনেক দূরের ব্যাপার ছিল, সেই সময়ও ইয়াহিয়া আর ফারল্যান্ড এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। পরবর্তীকালে ফারল্যান্ড আমাদের জানান, তিনি (ইয়াহিয়া) আমাকে বলেছিলেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে আরেকটি যুদ্ধের ধকল সামলাতে পারবে না। 'একজন সাধারণ পর্যবেক্ষকের কাছেও এটা স্পষ্ট ছিল। আমি জানতাম তিনি বিজয় আশা করেননি। কিন্তু আমার মনে হয়, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়াতে তিনি এক ধরনের স্বস্তি বোধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা সাগ্রহে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।'

ফারল্যান্ড ছোটখাটো শক্ত পোক্ত দেহের মানুষ। ভারী কণ্ঠস্বর, চুলে পাঁক ধরা এবং চতুস্কোণী চোয়ালের অধিকারী। পোশাক-আশাকে ফিটফাট এবং এক সময় তিনি যে একজন এফবিআই(ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) এজেন্ট ছিলেন, সেই ভাবমুর্তি তুলে ধরায় সচেষ্ট থাকতেন। তিনি একদা আইনজীবীও ছিলেন। ছিলেন কয়লা খনির অপারেটর এবং লবিয়িস্ট। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণপন্থী সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ- এর রিসার্স কাউন্সিল ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৫৭ সালে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার তাকে ডোমিনকান রিপাবলিকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান। তিন বছর থাকেন সেখানে। কাজ করেন একনায়ক রাফায়েল ট্রুজিল্লো ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যস্থকারী হিসেবে। বন্ধুসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ফারল্যান্ড এরপর যান পানামায়। সেখানে জন এফ কেনেডি প্রশাসনের প্রায় পুরো সময়টা কাটান।

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে ফারল্যান্ড যান ইসলামাবাদে। তিনি দেখতে পান, ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন না করায় তখনো পাকিস্তানিরা আমেরিকার প্রতি বিরুপ মনোভাব পোষণ করছে। পরে কিছু পাকিস্তানি তাকে সিআইএ এজেন্ট হিসেবে চিত্রিত করে। অভিযোগ তোলে, তিনি তাদের দেশ ধ্বংস করার চেষ্টায় রয়েছেন এবং বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। মদ্যপ একনায়ক ও রাষ্ট্রদূত যখন থেকে একত্রে বসে হুইস্কির স্বাদ নিতে আরম্ভ করেন এবং তাদের মধ্যে গোপন বিষয়াবলির বিনিময় শুরু হয়, ওই অভিযোগ এর কিছুদিন আগে তোলা হয়। যেসব পাকিস্তানি ফারল্যান্ডকে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বলে মনে করতেন, ভুল ধারণার শিকার ছিলেন তারা। ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে, ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতার যে চিত্র তিনি আমাদের দিয়েছেন, তাতে রাষ্ট্রদূতের বাঙালি বিরোধী প্রবণতা প্রকাশ হয়ে পড়ে :

বাঙালিরা মৃত দেহের সংখ্যায় অতিরঞ্জন ঘটিয়েছে রাজনৈতিক কারণে। তারা সর্বদাই নিজেদেরকে পাকিস্তানের বিস্মৃত জনগণ মনে করে এসেছে, দেখে এসেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে। বিপর্যয় সৃষ্ট দুর্দশা মোচনে সারা বিশ্ব যখন তাদের কাছে এগিয়ে গেল তখনই প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ প্রকাশ্যে এসে গেল আর মুজিব হয়ে পড়েন জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তিনি অথবা অন্য কেউ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগের পক্ষের অথবা বিপক্ষের গভীরতা অনুধাবন করলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মুজিবের জন্য সমঝোতার পথ রুদ্ধ করে দেয়।বাঙালিরা এই বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদকে নাটকীয় রূপ দিতে থাকে তখনই মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে ১২০০০ থেকে ২৮০০০; সেখান থেকে পনের লাখে উঠে যায়। আমাদের হিসাবে তিন লাখ নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। সংখ্যাটি অবিশ্বাস্য তথাপি বাঙালির হিসেবের কাছাকাছিও নয়। কিন্তু গুটিবসন্ত ও কলেরার প্রকোপ দেখা দেবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা কাটেনি। সামুদ্রিক তরঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে । পানিতে ডুবে যত লোক মারা গেছে, ততটা যায় নি রোগে।

ফারল্যান্ড মুজিবকে জানতেন এবং তাকে প্রাণবন্ত ও প্রাণপ্রাচুর্য সম্পন্ন দেখতে পান কিন্তু তিনি (মুজিব) গালভরা বুলি কপ্চাতে ভালবাসেন। তিনি ইয়াহিয়াকে জানতেন অনেক বেশি কিন্তু তার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা অস্বীকার করেন। 'আমাদের মধ্যে ছিল সাধারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক।' ফারল্যান্ড বলেন,' সামাজিকভাবে আমাদের সাক্ষাৎ হয় দুবার। সাধারণত আমি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতাম সকালে, অফিস সংক্রান্ত কাজে।' চাপ বাড়াতে ইয়াহিয়া তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফারল্যান্ড ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠানঃ '৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় ১২টা ৩০ মিনিটে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার বাসভবনে গিয়ে দেখা করি। আলোচনা ৩০ মিনিট কাল স্থায়ী হয় এবং এই

সাক্ষাৎ ছিল নিতান্তই ঘরোয়া। ভদ্রলোক বলতে চাইছিলেন...।' একজন বিদেশী কূটনীতিকের এই নির্ভরতার কোন তুলনা নেই।

ফারল্যান্ড জোর দিয়ে বলেন, 'ইয়াহিয়ার সঙ্গে যতগুলো বৈঠক তিনি দিয়েছেন, সবগুলোকেই তিনি শান্তি স্থাপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের ওপর যখন ইতিহাস লেখা হবে, প্রমাণিত হবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালা এবং আমাদের স্থানীয় কর্ম তৎপরতা শেখ মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখে। মুজিবের গ্রেপ্তারের পর আমি অনেকবার কথা বলেছি ইয়াহিয়ার সঙ্গে এবং প্রায়শই মুজিবের কথা উল্লেখ করেছে। আমি ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম, আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে এই, মুজিবই হচ্ছে ভবিষ্যৎ পাকিস্তান-পূর্ব এবং পশ্চিমের চাবিকাঠি। আমি ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলাম এই ব্যক্তিকে হত্যা না করতে এবং অবশেষে, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এক রাতে ইয়াহিয়া আমাকে বলেন, আপনি আমাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন। তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে না।'

ইয়াহিয়া মুজিবের ওপর তেমন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি যাতে তিনি তাকে চিরদিনের জন্য মুক্ত করে দেয়ার কথা ভাবতে পারতেন। যুদ্ধ শেষে ইয়াহিয়াকে এক অমর্যাদাকর অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। পতনের আগে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের মৃত্যুপরোয়ানা রেখে যান। তারিখের জায়গাটা খালি রাখেন, যাতে উত্তরসূরী তার সুবিধামতো তারিখটা বসিয়ে নিতে পারেন এবং মৃত্যুদণ্ডের দায় দায়িত্ব ইয়াহিয়ার ওপর চাপাতে পারেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার উত্তরসূরী অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ওই দলিল ব্যবহার করতে স্বীকৃত হন না।

সামরিক পরিস্থিতি বাংলাকে বিপরীত স্রোতে ঠেলে দেয়ায় ইয়াহিয়া আগের চেয়েও অধিক মাত্রায় ফার্ল্যান্ডের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এবং এই দু'ব্যক্তি এমন এ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যা একজন রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতের মধ্যে অস্বাভাবিক। প্রতিদিনই পাকিস্তান সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করছিল। আর এই সময়ে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের এমন একজন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল, যার সঙ্গে তিনি গোপন বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। কোন কোন জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্যরা রুঁখে দাঁড়িয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং মার খেয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ এলাকায় ভারতীয় সৈন্য পৌঁছানোর আগেই পালিয়েছে। ভারতীয়রা আকাশে দ্রুত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ভারতীয় পদাতিক সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম অভিমুখী সকল পথ কেটে দেয়। বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে একটি সংকীর্ণ ভূখন্ড চট্টগ্রাম। এই ভূখন্ডই ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সরবরাহ পাবার পথ, — প্রয়োজনে পলায়নেরও।

এ অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঢাকায় পশ্চাদপসরণ করতে হবে। তাদের রণকৌশল স্পষ্ট হয়ে গেল। ঢাকা জালের মতো জলপথে বেষ্টিত। এক মরণ পণ সেনাবাহিনী এ নগরীকে কয়েকমাস দখলে রাখতে পারে।

পল মার্ক হেনরী ছিলেন জাতিসংঘ সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল। যুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি ঢাকায় জাতিসংঘ মিশনের নেতৃত্ব দেন। রণপরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের বলেন, 'স্টালিনগ্রাদ পর্যায়ে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হবে আমরা ধারণা করেছিলাম। তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে গিয়ে শত্রুর শক্তিক্ষয় করার প্রস্তুতি নেয়। রণকৌশল অনুযায়ী একমাস বা দ'মাস পর কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন সূচিত হবে। তখন পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে এককভাবে ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়বে। আমেরিকান ও চৈনিকরা অধিক হারে পাকিস্তানে সরবরাহ পাঠাতে থাকবে এবং রুশীরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হবে অথবা ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে তাকে নামতে হবে। আমেরিকা চীনের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হবে।'

অটল প্রতিরোধের মনোবল ইয়াহিয়ার কোন অফিসারেরই ছিল না। ভারতীয় বিমান বাহিনীর মিগ গভর্মেন্ট হাউসে বোমা বর্ষণ করলে ছোট খাট দেহের এবং বিষন্ন চোখের অধিকারী পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক গভর্ণর ডাক্তার এ, এম, মালিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে নিজে ও তার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চান।

বেসামরিক সরকার ভেঙ্গে পড়ায় ঢাকা থেকে সভ্যতার সর্বশেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়। বদর স্কোয়াড এবং অনিয়মিত সশস্ত্র বিহারি বাহিনী বাসে চেপে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। আটক করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের। বন্দুকের মুখে ডাক্তার, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ও লেখকদের বের করে আনে ঘর থেকে। নিয়ে যায় শহর প্রান্তের এক জলাভূমির কাছে। এরপর পৈশাচিক নিপীড়ন চালিয়ে তাদের হত্যা করে। মৃতের তালিকায় যাদের নাম আসে তারা কোন বিচার পান না। তাদের হয়ে আদালতে কোন আবেদনও পেশ করা হয় না। মৃতের বেশিরভাগই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না। আসল ঘটনা হচ্ছে, তারা সুশিক্ষিত ছিলেন। আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এটাই ছিল একমাত্র অপরাধ।মনে হয়, পাকিস্তান সমরযন্ত্র বাংলার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।

ভয়ংকর ন'মাসের যে কোন সময়ে বাঙালি ও তার নেতাদের রক্ষা করতে পাকিস্তানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল প্রভাব কাজে লাগাতে পারতো। কখনোই তা করে নি।

প্রতারণার রাজনীতি

প্রেসিডেন্ট নিকসন ও হেনরি কিসিঞ্জার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে যেভাবে ব্যবহার করেন তাতে নিজেদেরকে তারা বিশ্ব নিন্দুকে পরিণত করেন। শান্তির জন্য কঠোর চেষ্টার ভান করে আদতে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটান এবং ব্যাপক যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়ান।

প্রেসিডেন্ট তার স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ভাষণে কংগ্রেসকে বলেন, 'যদি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা না দাঁড়াতাম যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতো; পশ্চিমাঞ্চলেও অধিক পরিমাণে আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়তো।' সত্য বটে., হোয়াইট হাউস যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে বাহ্যিকভাবে। ভেতরে— প্রেসিডেন্ট দপ্তর, সিচুয়েশন রুম এবং ইয়াহিয়ার প্রেসিডেন্ট ভবনের কথাবার্তা ছিল একদমই বিপরীত। এর বিশদ বর্ণনা পাঠকের জন্য হবে বিরক্তিকর।

১০ ডিসেম্বরের শেষ বিকেলে ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী জাতিসংঘ সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরীর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। এবং জাতিসংঘকে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ও 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে' ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। জেনারেল ফরমান বলেন, তার এই অনুরোধ ইয়াহিয়া অনুমোদিত।

স্মারকলিপিতে পাকিস্তানি সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে সম্মানজনক প্রত্যাবসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানি যারা ফিরে যেতে চায়, তাদেরও প্রত্যাবাসন চাওয়া হয়। নিরাপত্তা চাওয়া হয় লুটেরা বিহারীদের জন্যে; চাওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের কোন লোকের প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ যাতে সংঘঠিত না হয়, তার নিশ্চয়তা। লিপিতে আরো বলা হয়, 'সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্নটি বিবেচনায় আসে না এবং ওঠেও না। যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ' করা না হয় সেক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী তার শেষ ব্যক্তিটি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

হেনরির সঙ্গে ওইদিন সকালের দিকে বৈঠক করেন ফরমান। এরপর এই পাকিস্তানি জেনারেল স্মারক লিপির খসড়া তৈরি করেন। হেনরি আমাদের বলেন, আমরা দু'জনে প্রথমে একান্তে মিলিত হই। স্মারকের অর্ধেকই উৎসর্গ করা হয় শান্তিপূর্ণভাবে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে। সেখানে আরো

শর্ত ছিলো। কিন্তু এটাই ছিল স্মারকের মূল। আমি ফরমানের কাছে জানতে চাই এটা অনুমোদিত কী না। তিনি বলেন, অনুমোদন আছে।

পরে ওইদিনই হেনরী তার দুই সহকারীসহ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এ, এম, মালিক ও একজন পাকিস্তানি অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যান ফরমানের কাছ থেকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে। জেনারেল ফরমানের উর্ধ্বতন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী সেখানে ছিলেন না।

আমি পুনরায় ফরমানকে জিজ্ঞেস করি, হেনরি তার স্মৃতি হাতড়ে বলেন, 'জেনারেল ইয়াহিয়া কী এটা অনুমোদন করেছেন? ফরমান বললেন, 'এই মুহূর্তে ইসলামাবাদ থেকে আমি একটি বেতার বার্তা পেয়েছি। ইয়াহিয়া অনুমোদন করেছেন। একজন সৈনিকের কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে।'

হেনরি দ্রুত আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের কনসালদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর বার্তাটি পাঠান নিউইয়র্কে, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে। ফরমানের প্রস্তাব ওয়াশিংটনে পৌঁছলে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে নির্দেশ দেয়, তিনি যেন ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত আছেন কী না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বললো, 'সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সেনাবাহিনীকে রক্ষার জন্য একটা বড় রকমের প্রচেষ্টা গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি আমরা।'

বার্তাটি জাতিসংঘে পাঠিয়ে দিয়ে হেনরি ফিরে আসেন গভর্ণমেন্ট হাউসে এবং দেখতে পান গভর্ণর মালিক ভবনের এক প্রান্তে অপেক্ষা করছেন। তিনি পুনরায় নিশ্চয়তা দেন যেন প্রস্তাবটির অনুমোদন আছে। হেনরি আমাদের বলেন, 'কিন্তু দুর্বলচেতা মানুষ তিনি। মনে হলো, এ বিষয়ে কিছু যেন এড়িয়ে যাচ্ছেন। পরে দুই কর্ণেল আমার মঙ্গে দেখা করে বলেন, আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি কোনভাবেই অনুমোদিত হয় নি। ইয়াহিয়া মত বদল করেছেন।'

ইসলামাবাদে অবস্থানকারী কূটনীতিকরা ইয়াহিয়ার এই আপোষ বিরুদ্ধতার ব্যাখ্যা দেন। তারা জোর দিয়ে বলেন, আত্মসমর্পণের অনুমতি প্রদানের পরই পাকিস্তানকে সহায়তা দানে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের একাংশ প্রেরণের নিকসনের সিদ্ধান্তের কথা ইয়াহিয়াকে জানানো হয়। কূটনীতিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, এই ঘটনার পরই ইয়াহিয়া মত বদলান।

সমগ্র যুদ্ধের মধ্যে এবং এর অনুঘটনায় একদিকে প্রেসিডেন্ট নিকসন শান্তি প্রতিষ্ঠাতার মুখোশ পরার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে যুদ্ধের দাবানলে হাওয়া দিতে থাকেন। তিনি সংবাদ সম্মেলন ও তার কূটনীতি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা এড়িয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ নিজের দৈনন্দিন কর্মধারার অংশ বিশেষ টিভির অনুষ্ঠানের জন্য ধারণ করতে এনবিসির একজন ক্যামেরাম্যানকে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের অনুমতি দেন। পরে ওই মাসেই টিভি দর্শকরা দেখতে পান প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশকে

টেলিফোন করছেন এবং ভারত-পাকিস্তান সংকট নিয়ে তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। নিকসন তাকে বলেছেন, একে কেউ কেউ সারা বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় করতে চেষ্টা করবে এবং পরিণতও করবে। যা আপনি করতে পারেন, আপনাকে সেটাই করতে হবে। অন্য সব বিষয়ের চেয়ে এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা কী করেছি, আমরা রাজনৈতিক সমাধানের যে চেষ্টা চালিয়েছি,শরণার্থীদের জন্য আমরা যা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত সত্য ঘটনা তুলে ধরা। যদি দেখেন সিনেট এবং হাউসের কেউ আমাদের মতামত ভ্রান্তিজনক ভাবে উপস্থাপিত করেছেন,— তা যে কোন কারণেই হোক, সেক্ষেত্রে আমি চাই আপনি অত্যন্ত রুঢ় ও কঠোরভাবে তার মুখোমুখি লড়বেন, পরিষ্কার হয়েছে আমার কথা? সোজসুজি লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে নামবেন এবং চিড় ধরিয়ে দেবেন। কারণ, আপনি সঠিক জানেন আমরা কী করেছি, ঠিক আছে?

আমেরিকান জনগণের কাছ থেকে নিজের গোপন ষড়যন্ত্র আড়াল করতে হোয়াইট হাউস যদ্দুর সম্ভব করার, তার সবকিছুই করে। এমন কী এনবিসি টেলিভিশনের জন্য ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের একটি সাজানো বৈঠকের আয়োজন করে। টিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, নিকসন বসে আছেন তার নির্বাহী অফিস ভবনের ব্যক্তিগত কক্ষে। সেখানে আরো আছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স, অর্থমন্ত্রী জন কনলি, সিআই এ ডাইরেক্টর রিচার্ড হেলমস ও জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্ট মোরল্যান্ড। প্রেসিডেন্ট সাবলীল ভঙ্গিতে বললেন, ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয় নিয়ে। বললেন, নভেম্বর মাসে হোয়াইট হাউসে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার আলাপ সম্পর্কে। রজার্স সায় দেন, 'আমাদের দোষারোপ করা যাবে না। কেননা, বিশ্বে এমন অনেক অনেক অঞ্চল আছে, যেগুলোর জন্যে আমরা দায়ী হতে পারি না।'

আসল ওয়াসাগ বৈঠকটি হয় হোয়াইট হাউসের ভূগর্ভে সিচুয়েশন রুমে। এতে সভাপতিত্ব করেন কিসিঞ্জার। তিনি বৈঠকে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটান। প্রতিটি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি কিসিঞ্জারের একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ববোধ স্পষ্ট করে তোলে। 'প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর আমি প্রেসিডেন্টের তাড়া খাচ্ছি ভারতের প্রতি আমরা যথেষ্ট কঠোর নই বলে, ৩ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার অভিযোগ করেন। 'তিনি আবার আমাকে ডেকেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না আমরা তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছি। তিনি চান আমরা পাকিস্তানের অনুকূলে ঝুঁকি। তিনি মনে করছেন, যা-ই করছি আমরা তার ফল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।'

৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট শান্ত কণ্ঠে বলেন টিভিতে। অন্যদিকে কিসিঞ্জার ভারতের ওপর চাপ বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। বৈঠকে গোপনে কার্যবিবরণী হচ্ছে, 'ডক্টর কিসিঞ্জার আরো নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে ভারতীয়দের আমরা বিশেষ ধরনের শীতলতা প্রদর্শন করবো। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আচরণও করা হবে না।'

আমেরিকার নীতি নির্ধারকরা বাঙালি হত্যাযজ্ঞ নিয়ে, যা পূর্ব পাকিস্তানকে নিক্ষিপ্ত করে এই সংকটে এবং ন'মাসে যা ভয়াবহ রকমে বর্বরোচিত হয়ে উঠে,

তা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। কিন্তু যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী সাফল্য অর্জন করতে থাকে, সেই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পনের লাখ বিহারির নিরাপত্তার প্রশ্নে ওয়াসাগ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ইয়াহিয়ার সৈনিকদের মতোই বিহারিরাও বরং বাংলার চেয়ে উর্দুতেই কথা বলতে ভালবাসে। অনেকে বাঙালি নির্যাতনে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে।

৬ ডিসেম্বরের বেঠকে কিসিঞ্জার জানতে চান বিহারি নিধনযজ্ঞ ইতিমধ্যে ঘটেছে কী না। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার ডেপুটি ডাইরেক্টর মউরিস উইলিয়ামস বলেন, তিনি আশা করছেন নিধনযজ্ঞ একটা সংঘটিত হবে। বিহারিদের বাঁচাতে তিনি একটি 'আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগ' গ্রহণের পরামর্শ দেন। কিসিঞ্জার বলেন, 'রক্তস্নান রোধে' অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

একই বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি ইউ, অ্যালেক্সিস জনসন সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যুদ্ধের পর বাংলাদেশ 'আন্তর্জাতিক ঝুড়িতে' পরিণত হবে। কিসিঞ্জার রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দেন, 'অবশ্যই সেটা আমাদের ঝুড়ি হবে না।'

৮ ডিসেম্বরের বৈঠকে উইলিয়ামস আগের কিছু ভুল তথ্যের সংশোধন করেন। তিনি বলেন, শরাণার্থীদের জন্যে নির্ধারিত স্বল্প পরিমাণ অর্থ ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে। শরণার্থীদের দেখাশোনায় ভারত আসলেই বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শরণার্থীদের খাওয়ানোয় ভারতকে সাহায্য করতে কিসিঞ্জার আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট 'পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন' যে, হোয়াইট হাউসের অনুমোদন ছাড়া ভারতের জন্যে কোন তহবিল দেয়া যাবে না।

'পরবর্তী প্যাঁচটা কী হবে,' কিসিঞ্জার জানতে চান। তিনি উইলিয়ামসকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, ফেডারেল বাজেটে ভারতের জন্যে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হবে না। তিনি আরো বলেন, ' এটা কোনভাবেই যেন প্রকাশ না পায় যে, বাজেটে ভারতের জন্যে ' সাহায্য' বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ আছে, তা 'দুর্বৃত্ত' হোয়াইট হাউস সরিয়ে ফেলেছে।'

কিসিঞ্জার ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বন্দর অবরোধের অভিযোগ তোলেন। 'অবরোধে অংশ নিয়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের এক মিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ডুবে যেতে দিতে পারি কী? আমাদের আতংকিত করার তেমন সুযোগ কী ভারতীয়দের আমরা দিতে পারি যাতে ঘটনা থেকে নিজেদের আমরা সরিয়ে রাখি? যদি সরবরাহ প্রেরণের প্রয়োজন পড়ে, যুক্তরাষ্ট্র সেটা দিতে পারবে না?" তিনি বলেন।

জনসন বলেন, যুদ্ধরত দুটো দেশের এই অধিকার আছে, যে যার শত্রুকে অবরোধ করতে পারে। সেখানে অবরোধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদ করার কোন বৈধ অধিকার নেই। 'আমরা নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করছি না', কিসিঞ্জার তিক্ত কণ্ঠে পেশাদার কূটনীতিকের কথার জবাবে বলেন। ' প্রেসিডেন্ট কী চান সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। প্রেসিডেন্ট চান না নিরপেক্ষ থাকতে।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করেন ভারতই আক্রমণকারী। ভারতের মনের কথা আমরা সহজভাবে নিতে পারি না। 'ওই মহিলা (মিসেস ইন্দিরা গান্ধী) অনুভূতিহীন এবং দৃঢ়চেতা। শুধু বিদ্বেষ তাকে সোভিয়েতের তল্পীবাহক করবে না।'

ভারত ভীতিই কিসিঞ্জারকে এই সিদ্ধান্তে পরিচালিত করে যে, আমেরিকা খোলাখুলিভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। নয়াদিল্লী থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান, নতুন ইরানি রাষ্ট্রদূত তাকে জানিয়েছেন যে, ভারতীয় কর্মকর্তারা তার কাছে জানতে চেয়েছে ইরান ইয়াহিয়াকে মার্কিন অস্ত্র পাঠাচ্ছে কী না। তিনি সরাসরি অস্বীকার করে বলেছেন ইরান থেকে কোন অস্ত্র পাকিস্তানে যায় নি, রাষ্ট্রদূত কিটিং ওয়াশিংটনে প্রেরিত তার বার্তায় বলেন। কয়েক জায়গায় একই বিষয়ে আলোচনার মাঝপথে বাধা দিয়ে আমি বলেছি ইরান থেকে অন্যখানে অস্ত্র প্রেরণের জন্য আমেরিকার অনুমোদনের প্রয়োজন।'

আন্ডার সেক্রেটারি জন আরউইন ফিরতি বার্তায় কিটিংকে বলেন, 'গোয়েন্দা রিপোর্টে পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতীয় সামরিক লক্ষ্য সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা এসেছে তার আলোকে আমরা চাই বাইরে থেকে পাকিস্তানের সাহায্য প্রাপ্তি নিয়ে ভারতের যে উদ্বেগ রয়েছে, তার নিরসন না ঘটাতে। সাথে সাথে এখন থেকে দূতাবাস তৃতীয় দেশ থেকে সরবরাহ স্থানান্তরের প্রশ্নে ভারত সরকারের কাছে পূর্ব কথনের পুনরাবৃত্তি করবে না, কোন আশ্বাসও দেবে না।' বার্তার অনুলিপি সৌদি আরব, জর্ডান, ইরান ও পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রদূতদের বলা হয়, 'এসব দেশের সরকার তৃতীয় কোন দেশে অস্ত্র স্থানান্তরের চিন্তা ভাবনা করছে কী না, এর কোন ইঙ্গিত পেলে তা পররাষ্ট্র দফতরকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে' আরেকটি বার্তায় আরউইন কিটিংকে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে কথা বলতে নির্দেশ দেন, তিনি যেন তাকে (পররাষ্ট্র সচিব) দিয়ে বিহারিদের পক্ষ হয়ে এবং একই সাথে যুদ্ধ বন্দি ও আটকে পড়া বিদেশীদের জন্য মধ্যস্থতা করতে হবে। একই বার্তা ইসলামাবাদে ফারল্যান্ডের কাছে পাঠানো হয়। সঙ্গে এই লিপিটি যুক্ত করা হয় : 'যদি মনে করেন সম্ভব,— আমরা বিশ্বাস করি, এটা আমাদের অতিমাত্রায় কাম্য যে, আপনি পাকিস্তান সরকারকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য আমাদের গভীর মানবিক উদ্বেগের কথা জানাতে পারেন। জানাতে পারেন আমাদের আশাবাদ যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও প্রশাসন এমন ধরণের কার্যক্রম এড়িয়ে যাবে, যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন উস্কে দেয়। আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে এটা একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভবশীল বিষয়।'

কিটিং বার্তার জবাবে জানান, ভারত তাকে আশ্বস্ত করেছে যে, সে আন্তর্জাতিক আইনকানুন মানবে। ভারত বলেছে ' সীমা লংঘন যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে সে সম্ভব সব কিছু করবে।' ফারল্যান্ডের জবাব কী ছিল, আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু পাই নি।

৬ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে নুতন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত নবাবজাদা আগা মোহাম্মদ রাজাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনকালে নিকসন নিজেই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন

নি। তাকে সংবর্ধনা দেয়া হয় জমকালো পরিবেশে। সংবর্ধনার জবাবে রাষ্ট্রদূতের দেয়া বিবৃতিটা ছিল দীর্ঘ এবং ভাষা এমন, যা বিস্মিত করে পেশাদার কূটনীতিকদের, যারা সাধারণ সৌজন্যমূলক ভাষার সঙ্গে পরিচিত। তিনি বলেন, 'মি : প্রেসিডেন্ট, আপনার অবিচল সমর্থন এবং আমাদের সমসা অনুধাবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্ভবত অন্যদের চেয়ে আপনার জনগণই অনুধাবন করতে পারবনে ভাল। আমাদের সরকার ও পাকিস্তানি জনগণের জন্য এ অপরিমেয় শক্তির উৎস। এই শক্তি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মুক্ত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রতি গুরুতর হুমকিকে মোকাবেলা করতে পারে।' নিকসন জবাবে বলেনঃ 'সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আপনার জনগণ প্রাকৃতিক ও অন্যবিধ বিপর্যয়ে নিপতিত হয়ছে। আমরা সুখী, যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যয় সৃষ্ট সংকট ত্রাণে রিলিফ ও পুনর্বাসনে অর্থপূর্ণ সহায়তা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। আপোসের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি অর্জনে পাকিস্তান সরকার ও জনগণ যে প্রচেষ্টা নিয়েছে, তাকে আমরা সহানুভূতি ও আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করে এসেছি। উপমহাদেশের উত্তেজনা হ্রাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেয়া প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।'

আমেরিকার কূটনীতির মূল লক্ষ্যের স্বীকৃতি মেলে ভিন দেশের রাজধানী থেকে। লন্ডনে পদস্থ বৃটিশ কর্মকর্তারা মার্কিন দূতাবাসকে জানায়, তারা মনে করে যে, ভারতের সমালোচনায় গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'কৌশলগত ক্ষেত্রে ভুল' করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত মার্কিন দূতাবাসের ওই বার্তায় বলা হয় ব্রিটিশরা বিশ্বাস করে দু'পক্ষেরই ত্রুটি রয়েছে। এবং এই সন্ধিক্ষণে ভুলের বোঝা এ পক্ষ বা ও পক্ষের ওপর চাপিয়ে দেয়া অপরিহার্যভাবে একটি নিস্ফল অনুশীলন। বৃটিশ কূটনীতির সীমা নির্দেশক হচ্ছে নিজেদেরকে এর ভেতর নিক্ষেপ না করা। উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে যুদ্ধ শেষ হবার পর ব্রিটিশ স্বার্থেই ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে পরিমিত সম্পর্ক তাদের রাখতে হয়।'

নিকসন ও কিসিঞ্জারের এই ধরনের কোন দূরদৃষ্টি ছিল না। ভারত বিরোধী কূটনীতি একেবারে শেষতক বহাল থাকে এবং ফলাফল বিপর্যয়কারী হয়?

অশুভ সংকেত

১৯১৭ সালের ২ এপ্রিলে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহবানে প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসন জার্মান সামরিক গোয়েন্দা অপারেশনের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন : 'কোন স্বশাসিত জাতি তার প্রতিবেশী দেশে নিজেদের গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেয় না অথবা তেমন ষড়যন্ত্র পাকায় না, যা ঘটনাকে সেই সন্ধিক্ষণে উপনীত করায়, যেখানে তাকে সুযোগ এনে দেয় আঘাত হানার এবং জয় করে নেবার। ওই ধরনের অভিসন্ধি চোরাগোপ্তা পথে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করা যায় এবং সেখানে প্রশ্ন তোলারও কারো কোন অধিকার থাকে না... এ ধরনের কাজ সেখানে চালানো অসম্ভব যেখানে জনগণ সকল কর্তৃত্বের অধিকারী এবং দৃঢ়তা সহকারে দেশের সকল বিষয়ে তথ্য পাবার জন্যে বলতে পারে।'

উইলসন নিঃসন্দেহে একজন আদর্শবাদী। তার সময় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ছিল না। প্রতিষ্ঠিত হয় নি সামরিক সার্ভিসের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা এবং গড়ে ওঠেনি সিআইএ'-র প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে এই গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বব্যাপী শাখা-প্রশাখা।

৬ ডিসেম্বর নিকসন তার রুদ্ধদ্বার কক্ষের আলোচনার সারসংক্ষেপ ব্যক্ত করেন এনবিসির ক্যামেরার সামনে। তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতাদের তিনি বলেছেন : ' খবরের কাগজে তারা যা দেখেছেন বস্তুত এর ওপর তার চেয়ে আমরা বেশি কিছু জানি না। কারণ, আমি বলেছি এই একটি অঞ্চল, যেখানে আমাদের কোন সামরিক উপদেষ্টা নেই... আমি আজ সকালে নেতাদের বলেছি কোন পক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের লোক নেই... কোন আমেরিকান নেই। আমি বলতে চাইছি দূতাবাসে অ্যাটাশেই (সামরিক) মাত্র আছে। ভারতের অ্যাটাশে ভারতীয় রিপোর্টের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে আর পাকিস্তানের অ্যাটাশে পাকিস্তানি রিপোর্টের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। এবং মূলত ঘটছে এই-ই।'

' কিন্তু আমাদের বিবিন্ন স্বতন্ত্র সূত্রও রয়েছে' কিসিঞ্জার মাঝখানে সংযোজন করেন।

'হাঁ, আমি জানি, আমি জানি', প্রেসিডেন্ট রুষ্ঠ কণ্ঠে বললেন। ক্যামেরা ঘুরে গেল 'তার কোনটাই নির্ভরযোগ্য নয়।'

'মোটেই কোনটা নির্ভরযোগ্য নয়' কিসিঞ্জার শুধরে দেন এবং জোর দেন 'মোটেই' শব্দটির ওপর।

ঘটনা হচ্ছে, সিআইএ ভারত সরকারের প্রতিটি স্তরে অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং এই সব 'স্বতন্ত্র সূত্র' ওয়াশিংটনে সরাসরি রিপোর্ট পাঠাতে থাকে। রিপোর্ট পাঠায় সৈন্য বিচলন, সরবরাহ ও সমর কৌশলের ওপর। এমন কী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কোন কোন গোপন আলোচনার বিষয়বস্তুও প্রেরণ করে।

আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তিতে গণিতশাস্ত্র এবং আলোকচিত্রের বিশ্লেষণের কাছে সূত্রপন্থি ও কায়িক সংগ্রহ সূত্র অনেক কম মূল্যবান পণ্য। গোয়েন্দা পরিদপ্তর তার তথ্য জোগাড়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে সিআইএ-র 'পরিক্রমণশীল উপগ্রহ এবং ভূপৃষ্ঠ অভিমুখী আড়িপাতা যন্ত্র থেকে। এ সংগ্রহ উৎকৃষ্টতম হিসেবে বিবেচিত। এতদসত্বেও ভারত-পাকিস্তান সংকেটর সময় বেশির ভাগ তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনা পরিদপ্তরের প্রাচীন পদ্ধতি সম্বলিত সিআইএ-'র নোংরা প্রতরাণামূলক বিভাগ।'

ভারত ও পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পরিকল্পনা পরিদপ্তরের এজেন্ট নিয়োজিত ছিল। এজেন্টদের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অনুপ্রবেশ কিছুকাল ধরে চলে আসছিল এবং অনেক সংবাদদাতাকে পুরোনো বলে অভিহিত হয়। বলা হয়, তারা নির্ভরযোগ্য।

তথাপি সিআইএ অথবা নিদেনপক্ষে এর পরিচালক রিচার্ড হেলমস একেবারে অভ্রান্ত ছিলেন না। কোন কোন সময় ওয়াশিংটন সোশ্যাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে তিনি স্বীকার করেন যে, কী ঘটছে তার জানা নেই অন্য সময় দেখা গেছে মূল্যায়ন ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। অন্তত একবার তিনি গ্রুপকে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ পাঠাতে তিনি ভুলে যান। সিআই-র যাবতীয় সম্পদ কাজে লাগানোতে তিনি ব্যর্থ হন। এতে ওয়াসাগ বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিরা তার ওপর ক্ষুব্ধ হন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো ৩ ডিসেম্বর তাকে বলেন, ভারত যেসব অঞ্চল দখল করে নিয়েছে সেগুলো তিনি যদি মানচিত্রে দাগ কাটতে পারেন, তো কাজে দেবে।'

দু'ব্যক্তি যাতে তার ওপর রুঢ় না হন, হেলমস সে ব্যাপারে অতিমাত্রায় সতর্ক থাকতেন। একজন নিকসন, অন্যজন কিসিঞ্জার। এই দু'জন ছিলেন তার ক্যারিয়ারের নিয়ন্ত্রক যেদিকে তারা তাকে হেলতে বলতেন সেদিকেই হেলতেন। কিসিঞ্জার আসল ঘটনার যে বিকৃত ভাষ্য দেন, তা নিয়ে হেলমস একবারও বিতর্কে যান নি।

৩ ডিসেম্বর হেলমসকে কিসিঞ্জারের চাপের মুখেই রিপোর্ট করতে হয় যে, ' নিশ্চিতভাবে' ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানের 'ক্ষুধাংশ' দখল করে নিয়েছে। ৫ ডিসেম্বর তিনি ওয়াসাগ বৈঠকে বলেন, ' স্থলে এখনো ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারে নি।'

নিয়মিত ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে সিআইএ কর্মীরা তাদের সংগৃহীত সংবাদ পাঠাতে থাকে নিরতিশয় পেশাদারি আবেগ শুন্যতায়। তাদের অনেক রিপোর্টই সংবাদ পত্রের রিপোর্টারদের রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যায়। তবে কিছু কিছু রিপোর্ট ছিল নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রায় প্রতিটি স্থুল রিপোর্টই ছিল অভিপ্রায় সিদ্ধ। আর এ সবেরই বিশ্লেষণ করা হয় ওয়াশিংটনে।

৮ ডিসেম্বর মিসেস গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে সিআই এ একটি রিপোর্ট সংগ্রহ করে। ওই রিপোর্টের অন্তর্গত ইঙ্গিত হচ্ছে, ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর একটি বড় রকমের হামলা চালাতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা রিপোর্ট হিসেবে সিআইএ এই রিপোর্টকে দেখে না। পরদিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকে রিপোর্টের তালিকায় ওই রিপোর্টটিকে পাঁচ নম্বরে রেখে বলা হয় : পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ থেমে গেলে পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর অফিসের কাজ কর্মে নাক গলাবার সুযোগ আছে, এমন একটি সূত্র মতে, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির ' মিটমাট' যে মুহূর্তে হয়ে যাচ্ছে, তার পর পরই ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলা পরিচালনা করবে। সিআইএ তার রিপোর্টে এও যুক্ত করে : 'ভারত সরকার আশা করে যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি সমস্ত গুরুত্বপর্ণ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে।'

আরেকটি গোয়েন্দা রিপোর্ট, যা ওই রিপোর্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত, পররাষ্ট্র দপ্তর তাকেও গুরুত্বহীন করে আরো নিচে নামিয়ে আনে এবং পরিস্থিতির রিপোর্ট তালিকায় ৩০ নম্বরে নামিয়ে এনে বলা হয় : 'এই ধরনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে, যেই মাত্র পূর্ববাংলা মুক্ত হচ্ছে সেই মুহূর্ত থেকে মিসেস গান্ধী যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হবেন এবং আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা গ্রহণ করবনে। এমন একটি সরকারি ইঙ্গিত মিলেছে যে, ভারত সরকার তখনি যুদ্ধ বিরতি করতে পারে যদি পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি বাহিনী দ্রুত আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয়। অপরদিকে আমাদের হাতে নতুন কয়েকটি রিপোর্ট আছে তাতে প্রতীয়মান হয়, ভারতের অভিপ্রায় শুধু পূর্ব বাংলা মুক্ত করা নয়। কাশ্মীরে তার সীমান্ত রেখা সোজাসুজি টেনে নেয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আকাশ শক্তি ও সমরাস্ত্র ধ্বংস করে দেয়া। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্বাঞ্চলে লক্ষ্য অর্জনে চার থেকে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য প্রেরণ করবে। প্রাথমিক পর্যায়ের সেনা বিচলন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলে খবর আছে'

এই সব খবর হতে হোয়াইট হাউস পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। যদিও সামিরক নেতারা দেশের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সেনাবাহিনীর বিচলনে ভারতের সামর্থ্যকে নাকচ করে দেন। ৬ ডিসেম্বরের ওয়াসাগ বৈঠকের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয় : 'জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেছেন, ভারতীয় পরিবহণ সামর্থ্য এমন সীমিত যে, পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে এক ডিভিশন পদাতিক সৈন্য বিচলনে তার সম্ভবত কমপক্ষে এক সপ্তাহ লাগবে। পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে সকল ভারতীয় বাহিনীর বিচলনে একমাসেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।' ১৩ ডিসেম্বর সিআইএ রিপোর্ট করে, ভারতে রুশ

রাষ্ট্রদূত নিকলে এম. পিগভ বলেছেন, 'যত দ্রুত সম্ভব ভারতের বাংলাদেশ দখলের চেষ্টা করা এবং তারপরেই তাকে যুদ্ধ বিরতি গ্রহণ করা উচিত.. এই কারণে যে, ভারত এক বিস্ময়কর সামিরক বিজয় অর্জন করেছে। পাকিস্তান এখন আর মোটেই কোন সামরিক শক্তি নয়। অতএব, যে সামরিক যন্ত্র এখন আর অস্তিত্ব সম্পন্ন নয়,তা ধ্বংসের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ পরিচালনা করা ভারতের জন্যে অপ্রয়োজনীয়।'

এতদসত্ত্বেও পরে প্রেসিডেন্ট নিকসন কংগ্রেসকে বলেন : ৬ ডিসেম্বরের সপ্তাহকালে আমরা বিশ্বাস উৎপাদন যোগ্য ইঙ্গিত পাই যে ভারত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর দখল ও পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানে সামরিক শক্তি ধ্বংসের চিন্তাভাবনা করছে। আমরা এই ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করতে পারি না।'

আগে সঠিক প্রমাণ জোগাড় করেন নেপালে মার্কিন ডিফেন্স অ্যাটাশে কর্নেল সেলভিন হোস্ট। তিনি ওয়ার্শিন্টনকে জানান, ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি 'পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় রণকৌশল' আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, ভারতীয় লক্ষ হচ্ছে, যতক্ষণ না বাংলাদেশ সরকার অধিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাশ্মীর প্রবেশে বাধা দানে সেখানে যুদ্ধ করা। পুর্বাঞ্চল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তার পূর্বতন সীমান্তে সৈন্য সরিয়ে নেবে যদি পশ্চিম পাকিস্তান তেমনটি করে। তিনি বলেন ভারতীয়রা পরিকল্পনা নিয়েছে যে, ' বিশ্বনিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে কার্যসাধন করবে মার্কিন সাহায্যের অবাসন ঘটাবে ইত্যাদি এবং এও অবগত যে, মার্কিন জনগণ ও নেতৃত্ব 'ভুলে যাবে। ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে সাহায্য আবার শুরু হবে।'

ব্যাপক সংঘর্ষের সম্ভাবনা যাচাই করে পেন্টাগণ। পদস্থ কর্মকর্তারা রাশিয়া ও চীনের লাগাতর ঝগড়ার রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করেন সতর্কতার সঙ্গে— যা তীব্র হয় ভারতের প্রতি রাশিয়ার সমর্থনে, চীনের পাকিস্তান প্রীতিতে। পেন্টাগণের হিসেবে দেখা গেল, যুদ্ধ যদি বেঁধেই যায় সেক্ষেত্রে রাশিয়ার আছে নিরতিশয় সামরিক শ্রেষ্টত্ব। আছে অনেক বেশি ট্যাংক, বিমান ও যুদ্ধ জাহাজ। আছে অধিকতর ভাল পরিবহণ ব্যবস্থা, অধিকতর উন্নত ভিত সম্পন্ন শিল্পকারখানা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রাশিয়ায় আছে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার।

অন্যদিকে চৈনিকরা উন্মত্তের মতো কাজ করে চলেছে তাদের পারমাণবিক ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে। ইতিমধ্যে তারা নতুন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনে সক্ষম হয়েছে, যার পাল্লা রাশিয়ার অভ্যন্তরে আঘাত হানার জন্যে যথেষ্ট। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হতেই এই ক্ষেপনাস্ত্রের কয়েকটি বসিয়ে ফেলা হয়। ভীতি প্রদর্শন ও বাধাদানে চীন এগুলোই তুলে ধরতে চায়।

পারমাণবিক বোমা বহনকারী চীনের ব্যালেস্টিক ক্ষেপনাস্ত্রের বিকাশ সাধন করা হয় সিনকিয়াং প্রদেশে। ওই এলাকাটি চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তে রুক্ষ পর্বতবেষ্টিত একটি প্রায় জনবসতিহীন ভূখণ্ড। চৈনিক সরকার অন্য অঞ্চলের লোকজনদের সিনকিয়াংয়ে এসে বসতি গড়ে তোলার উৎসাহ দিয়ে আসে ১৯৬০

সাল থেকে। তথাপি স্থানীয় টার্কিকরা জনবসতির শতকরা ষাটভাগ। এরা তুর্কী যাযাবর গোষ্ঠীর বংশধর, যারা মধ্য এশিয়া থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এদের ভাষা তুর্কীদের মতোই। সীমান্তের অপর পারে, রাশিয়ার সীমান্ত বরাবর পর্বতশ্রেণী এলাকায় বসবাসকারী টার্কিকদের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে ভাষা ও মানসগত ক্ষেত্রে। পর্বত ডিঙ্গিয়ে একে অপরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সেই প্রাচীন রীতি রাজনীতি ভাঙ্গাতে পারে নি আজও।

এই প্রদেশে চৈনিকদের আগমন, বসতি স্থাপন ও পিকিংয়ের আদর্শগত লড়াই সিনকিয়াং-এর কিছু রূঢ় টার্কিকের জীবনধারায় পরিবর্তন সূচিত করে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে তারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটায়। চৈনিকরা কঠোর হস্তে তা দমন করে। কিছু টার্কিকরা পালিয়ে পর্বত অতিক্রম করে চলে যায় তুরস্কে, কিছু সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ে রাশিয়ায়। সেখানে তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে ফিরে আসার।

সিনকিয়াংয়ের টার্কিক অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের কয়েকটি দিকে মিল দৃশ্যমান। বাঙালিরা সীমান্তের ওপারে সহমর্মীতার সন্ধান পায়। আর চীনের টার্কিকদের স্বাগত জানায় রুশীরা। বাঙালিরা ভারতে গেরিলা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। সিনকিয়াংয়ের টার্কিকদের নিজস্ব অধিনায়কসহ লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করতে দেয়া হয় সোভিয়েত সীমান্তে।

পেন্টাগনের লোকজন আরেকটি দলিল খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে। একটি গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট। তাতে সিনকিয়াং-এ সোভিয়েতের সম্ভাব্য হামলার কথা বলা হয় (সম্ভাব্য রচিত থাকে) এক সিনকিয়াং-এর টার্কিকদের মুক্তকরণ ও চৈনিক পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা ধ্বংসে সোভিয়েতের অগ্রআঘাত হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

নিঃসন্দেহে এটা অনিশ্চিত সম্ভাবনা মোকাবেলায় রচিত পরিকল্পনা।

সত্যে রঙ চড়ানো

আমেরিকার উচ্চারিত বাক্য একদা তার সোনার মতোই খাঁটি ছিল। আজ বিশ্বে তার কথায় কারো আর আস্থা নেই। বহুবারই যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্ররা শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনা তারা গোপন করতে চেয়েছেন কিন্তু তাতে বিব্রতকর অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছে। একটার পর একটা কুৎসিত মিথ্যায় তারা আটকে গেছেন। এমন কী যখন তারা সত্য বলেন তখনো তাদেরকে বিশ্বাস করা হয় না। এটা বিশ্ব ঘটনাবলিতে মার্কিন কর্মতৎপরতার প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতাকে হ্রাস করেছে। বিষয় ছোট হোক অথবা বড় এবং তা থেকে সামান্যতম সুবিধা লাভের সম্ভাবনা যেখানে ক্ষীণ, সেখানেও সত্যে রঙ চড়ানো সরকারি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে মার্কিন কুটনীতির প্রায় প্রতিটি ভাঁজে মিথ্যার বেসাতি করা হয়। বিশ্বকে বিশ্বাস করানোর হোয়াইট হাউসের প্রয়াস ওই কূটনীতির ভাঁজে ভাঁজে স্পষ্ট ধরা পড়ে। আর সেটা হচ্ছে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিল ভারতই আর সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্র ছিল নিরপেক্ষ।

৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার ত্রিশতম বার্ষিকী দিবসে হেনরি কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের নিয়ে বসেন পটভূমি বিষয়ক উপদেশ দান সংবাদ-বৈঠকে। এটি ওয়াশিংটনের একটি নিয়মিত প্রথা, সংবাদ সম্মেলন থেকে আলাদা চরিত্রের। নিয়মানুযায়ী কর্মকর্তা নিজের পরিচিতি আড়াল রেখে এতে বলতে পারেন। জনসাধারণকে জানানোর প্রয়োজন পড়ে না কে বলছেন।

সেই মতো কিসিঞ্জার একটি প্রকাশিত সংবাদের যথার্থতা নিয়ে বিতর্কে নামেন। তিনি বলেন হোয়াট হাউসের একজন 'বেনামী' কর্মকর্তার ছদ্মাবরণে প্রকাশিত ওই সংবাদে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানপন্থি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, রিপোর্ট গুলো 'সঠিক' নয়। সাথে সাথে বেশ জোর দিয়ে বলেন, কোন কারণ ছাড়াই এবং কোন হুঁশিয়ারি ব্যতিরেকে পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে ভারতই পরিণত হয়েছে আক্রমণকারীতে। সুবিধা দেবার বার বার পাকিস্তানি প্রস্তাব এবং শান্তি স্থাপনে ওয়াশিংটনের অতিমানবিক প্রচেষ্টার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বৈঠকে বেনামী কিসিঞ্জার ছিলেন সুসংস্কৃত এবং বিশ্বাস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কিন্তু সর্বতোভাবে সত্যবাদী নন।

কিসিঞ্জারের উপদেশ দান সংবাদ-বৈঠকের পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেস সার্ভিসের আলেকজান্ডার এম সুলিভান। এটা মার্কিন তথ্য দপ্তরের সরকারি বার্তা বিভাগ। বিদেশী সংবাদপত্র ও রেডিও সেন্টারে এখান থেকে বিনামূল্যে সংবাদ বিতরণ করা হয়। সুলিভানের বিবরণটি ডাহা মিথ্যায় ভরা।

সুলিভান লেখেন, প্রশাসন গভীর বেদনার সঙ্গে 'স্বীকার করছে' যে, ভারতই হচ্ছে হামলাকারী। বিবরণে যুক্তরাষ্ট্র ভারত বিরোধী, এ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

সেই তথাকথিত সৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নয়াদিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের মেইলপ্রিন্টার এবং কেনেথ কিটিং সেটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিবরণে বলা হয় :

- যুদ্ধ লেগে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র বিস্মিত হয়েছে।
- ভারতের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্র দুর্ভিক্ষ রোধে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে।
- আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে রিলিফ বিতরণে পাকিস্তান সম্মত হয়েছে। এতে ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না।
- পাকিস্তান সম্মত হয়েছে যে, সে 'সকল শরণার্থীর জন্য সাধারণ ক্ষমা সম্প্রসারিত করবে।'
- মুজিবের সঙ্গে তার আইনজীবীর মাধ্যমে যোগাযোগে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র কে অনুমোদন দিয়েছে ব্রোহী নামক এক ব্যক্তিকে পাকিস্তান সরকার নিযুক্ত করে কিন্তু তাকে মুজিব প্রত্যাখ্যান করেন।)
- ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কিসিঞ্জার তার সাত সাতটি বৈঠকে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স তার আঠারোটি বৈঠকে স্পষ্ট বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিচারে পাকিস্তান ও মুজিব অনুসারীদের মধ্যে সমঝোতার জন্য অপরিহার্যভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন থাকতে হবে। তারা আরো বলেছেন, ওয়াশিংটন স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে।
- ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদ পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আলোচনায় বসতে একটি সঠিক সময়সূচি নির্ধারণে প্রস্তুত ছিল।
- বিবরণ পড়া শেষ করেই এর ভেতরকার প্রতারণা তুলে ধরে কিটিং ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠান। 'যুদ্ধে মার্কিন জনগণের অবস্থান,' এই শিরোনাম করেন ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রদূত তার জবাবের।

আজ সকালের তারবার্তায় আসা নিজের নামে লেখা আইপিএস-এর হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা সুলিভানের বিবরণ পড়তে আমি দারুণ আগ্রহী ছিলাম। এতে বর্তমান সংঘর্ষের সর্বশেষ পর্যায় এবং একে পরিহারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে

হোয়াইট হাউস কর্মকর্তাদের ব্যাখ্যার রিপোর্ট আছে। সাধারণ্যে আমাদের অবস্থানের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে কৌশলী হবার প্রয়োজনীয়তাকে প্রশংসা করি। গত আট মাসে ঘটে যাওয়া আমার জানা বিষয়ের সঙ্গে বিবরণে বিবৃত অংশের মিশনা খাওয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি না।

বিশেষ করে, সুলিভান বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৫ মিলিয়ন ডলারের রিলিফ কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র সরকার আরম্ভ করে 'ভারত সরকারের বিশেষ অনুরোধে।' আমার অনুস্মৃতি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জ্ঞাত করা পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু, যে আলোচনা নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়, সেটা হচ্ছে, ভারত সরকার রাজনৈতিক সমাধানের আগে পূর্ব পাকিস্তানে কোন রিলিফ কার্যক্রম শুরু করার ব্যাপারে অনাগ্রহী। এই যুক্তিতে যে, এই ধরনের প্রচেষ্টা 'ইয়াহিয়া খানকে স্বস্তি এনে দিতে পারে'।

সকল শরণার্থীর জন্য ইয়াহিয়ার ৫ সেপ্টেম্বরের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বৈশিষ্ট্য বিবরণে আসেনি। ঘোষণায় বলা হয়,'যারা ইতিমধ্যে বিশেষ অপরাধে অভিযুক্ত'সাধারণ ক্ষমা তাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। একে আমি ছোটখাট আমলাতান্ত্রিক অনুল্লেখ বলে মনে করি না।

বিবরণে ইঙ্গিত দেয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ডক্টর কিসিঞ্জার, দু-জনেই রাষ্ট্রদূত ঝা-কে জানিয়েছেন যে, ওয়াশিংটন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে। আমি আমাদের বার বার উচ্চারিত বাক্য সম্পর্কে সচেতন। আমার সচেতনতা এই যে, সমাধানের জন্য আমাদের কোন ফর্মূলা নেই। এবং আমাদের বিশ্বাস সমঝোতা সম্ভবত স্বায়ত্তশাসনের মধ্যেই হবে– স্বাধীনতায় নয়। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে এই কারণে-স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে দেয়া কোন বিশেষ স্বতন্ত্র বিবৃতি সম্পর্কে আমি অনবহিত।

এছাড়া বিবরণ অুযায়ী সংশ্লিষ্ট দপ্তর ১৯ নভেম্বর ঝা-কে জানায় যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদ আলোচনার জন্য একটি সঠিক সময়সূচি তৈরিতে প্রস্তুত ছিল।' আমার নথিপত্রে (নথি নম্বরঃ২১১৩৮৪) এই আলোচনা সম্পর্কে একটি মাত্র বার্তা আছে। তাতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আসেনি।

দিল্লী ও ইসলামাবাদ থেকে প্রেরিত গোয়েন্দা দলের বিপুল প্রয়াসলব্ধ গাদা গাদা রিপোর্ট এবং ওয়াশিংটনে আমার আলোচনার আলোকে এই বিবৃতি বুঝতে অক্ষম যে, 'সামরিক কার্যক্রম যে আসন্ন, ওয়াশিংটনকে সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারনা দেওয়া হয়নি।' উদাহরণের জন্যে ১২ নভেম্বরের ডিআইএইবি ২১৯-৭১ নম্বর নথি দেখুন। তাতে নির্দিষ্ট করে বলা আছে যে যুদ্ধ 'আসন্ন'।

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, এ বক্তব্য মনে হয় অতিকথন। কারণ, ইসলামাবাদকে প্রেরিত ১১৭৬০ বার্তায় বলা হয়, ২১ নভেম্বর রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া বলেছেন, ফারল্যান্ড-ব্রোহী বৈঠক একটি চমৎকার ধারণা । তাতে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড 'অন্তত ব্রোহীর

কাছ থেকে বিচার ও বিচারপ্রণালী সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নিতে পারবেন' ১১৭৬০ নম্বর বার্তায় এর চেয়ে বেশি কিছু বলা হয়নি।

ব্রোহীর মাধ্যমে 'মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ সংক্রান্ত অনুমোদন সম্পর্কে' আমি জ্ঞাত নই। যাহোক, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সবাই এ ব্যাপারে অস্বচ্ছভাবে অবহিত। ইয়াহিয়া রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ২ ডিসেম্বর বলেন, (ইসলামাবাদ থেকে প্রেরিত ১১৯৫৫ নম্বর বার্তা অনুযায়ী,) অভিযোগ করা হয়েছে, ব্রোহী তার (মুজিব) সঙ্গে দেখা করতে চান না।

বিবরণে জাতিসংঘের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে রিলিফ বিতরণে পাকিস্তান সরকারের সম্মতি প্রদানের বিষয়টি দুর্বোধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই কারণে যে, জাতিসংঘ কখনো চায়নি অথবা তেমন প্রচুর লোকও রাখতে চায়নি পূর্ব পাকিস্তানে রিলিফ বিতরণের জন্য। আগাগোড়াই এটা পাকিস্তান সরকারের হাতে ছিল। আগ বাড়িয়ে যে মন্তব্য আমি করেছি, তা করেছি পূর্ণমাত্রায় এই অবগতি থেকে যে, বেদনাদায়ক ঘটনাবলির সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আমি অনবহিত। যা আমি জানি, তার ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করি না সুলিভানের বিবরণে আসা বিষয়াবলি আমাদের অবস্থানে নতুন কোন কিছু যুক্ত করা হবে কিংবা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতায় কোন মাত্রা যোগ করবে।

ঘটনাকে বিকৃত করার হোয়াইট হাউসের এই বিষয়টি কিটিং মেনে নিতে চান নি। যৌবনকাল থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং সুনাম অর্জন করেছেন। কিসিঞ্জারের মিথ্যার বিরোধিতা করেছেন বটে, কিন্তু বিষয়টি জনগণের সামনে উপস্থাপনের ভাবনা তার মধ্যে প্রবলভাবে অনুভূত হয় নি। তার এই ব্যাপারটি আমি তখনি জানতে পাই যখন তার ওই গোপন বার্তার একটি কপি আমার হাতে আসে। হোয়াইট হাউস যে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ায়, কিটিংয়ের পক্ষে তার অপনোদন ঘটানো কার্যত অসম্ভব ছিল।

আরেকটি মিথ্যার জন্ম হয় দু'পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে যাওয়া পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত আমেরিকানদের অবস্থান থেকে। আকাশ-যানের বাণিজ্যিক পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছিল ঢাকার দিকে। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরক্ষা বূহ্য রচনা করে তৈরি হয়ে বসেছিল পাকিস্তান বাহিনী। মার্কিন কনসাল জেনারেল হাবার্ট স্পিভাক আমেরিকানদের অপসারণের প্রশ্ন তুলে ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন বার্তা পাঠান :

অবস্থানগত ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রমে পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়ার ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং পূর্ব বাংলার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অধিকমাত্রায় ক্ষুব্ধ করতে বাধ্য। যদি ভারত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় এবং স্বাধীন (অথবা স্বাধীনতার ভান) বাংলাদেশের জন্ম ঘটে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি এই কনস্যুলেটের জন্যে অসহনীয় হয়ে উঠবে। ধারণা করছি, সে রকমই মনে হচ্ছে, ঢাকা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন এই কনস্যুলেট জেনারেল তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে কোন আইনগত

ভিত্তি পাবে না এবং এখানে যে সব কর্মী থাকবে নিঃসন্দেহে তাদেরকে শত্রুপক্ষীয় লোক হিসেবে দেখবে জনগণ ও সরকার।

স্পিভাক কনস্যুলেটের কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে এনে তত্ত্বাবধায়ক দল পর্যায়ে রাখতে সুপারিশ করেন। তাতে বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে নিরাপদে বিমান পরিচালনার সমঝোতায় আসতে এবং এই সমঝোতার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ ফ্লাইটে করে আমেরিকানদের অপসারণ করতে হবে।

৯ ডিসেম্বর তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণের এখনই হয়তো সময়, যা পরিণামে কূটনীতিক স্বীকৃতির পথ উন্মুক্ত করবে। তিনি জানান, তিনি এবং তার 'প্রাণকেন্দ্র' কর্মীরা থেকে যাবার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। 'যুগ পরিবর্তনকারী' এই কালে 'তারা প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে চান। যদি কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়, তা যতই সীমিত গণ্ডীতে করতে দিক বাংলাদেশ সরকার, তার মধ্য দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে চান তারা। কেননা, বাংলাদেশ সরকার, প্রকৃত প্রস্তাবে নিকট ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।'

ঢাকায় পঁচাত্তর জন আমেরিকান ছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিলেন কনস্যুলেটের কর্মচারী। বসন্তকালে প্রথম যখন সংকট শুরু হয় তখনই এদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের সরিয়ে আনা হয়। অন্যান্য কূটনীতিক ও জাতিসংঘের কর্মচারীসহ অবরুদ্ধ ঢাকায় বিদেশি জনসংখ্যা তখন মোটামুটি পাঁচশ'। এছাড়া ছিল সাংবাদিক ও রিলিফ কর্মী। এরা সরে যাবার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। ঢাকার যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠতে থাকায় যারা সরে যেতে চায়, তাদেরকে বের করে আনার জন্য আন্তর্জাতিক অপারেশন মিশন সৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বৃটিশরা দেয় তিনটি পরিবহণ বিমান, কানাডা একটি দেবার প্রস্তাব দেয়।

কিছু সমস্যা দেখা দেয়। অপসারণকালে ঢাকায় বোমা বর্ষণ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয় ভারতীয়রা। তবে দাবি করে, ঢাকাগামী ও বহির্গামী সকল ফ্লাইট কোলকাতায় নামতে হবে পরিদর্শন করিয়ে নেবার জন্যে। পাকিস্তান এই শর্তে প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়। বৃটিশরা আরো বড় সমস্যার কথা তোলে। ঢাকা রানওয়ে ভারতীয় বোমা বর্ষণে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমান অবতরণের ব্যাপারে তারা সংশয় প্রকাশ করে। প্রচুর মেরামতের পরই কেবল বিমান অবতরণ যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হেলিকপ্টার জোগাড়ের কথা বললো। পাল্লার মধ্যে কোন হেলিকপ্টার ঘাঁটি ছিল না। কিন্তু এই অনুরোধে আমেরিকান নৌহস্তক্ষেপে সুযোগ সৃষ্টির পক্ষে একটি আড়াল তৈরি হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একটি টাস্ক ফোর্স, পরে যার কথা প্রকাশ করা হয়, বঙ্গোপসাগরে পাঠানো হয় অপসারণ কাজে সহায়তা দানের জন্য। কিন্তু নৌবহরের মিশন সম্পর্কে এই ভাষ্য ছিল একটি আবডাল। অপসারণ-এর কর্তা অন্তর্ভুক্ত হবার আগেই নৌবহরের জাহাজগুলো ছিল যাত্রা পথে, কড়াকড়িভাবে সামরিক উদ্দেশ্যে। নৌবহরের সঙ্গে যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গোপন বার্তার বিনিময় হয়, তা থেকে এ তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সম্ভবত এটা কাকতালীয় ছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল জন এস ম্যাককেনই ছিলেন বঙ্গোপসাগরে নিয়োগ পরিকল্পনার মুখ্য মস্তিষ্ক ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে ডোমিকান রিপাবলিকে মেরিন সৈন্য অবতরণ করায় যে টাস্কফোর্স, তার অধিনায়কত্বে ছিলেন তিনিই। এক্ষেত্রেও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী একটি সরকার প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হয় অপসারণ নামক শব্দটির মিথ্যার আড়ালে।

এটাও হয়তো কাকতালীয় ছিল যে, বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে টাস্কফোর্স রওনা হবার একদিন পর, ১১ ডিসেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে অপসারণ ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়। অথচ ওই দিনই একটি ফ্লাইটের ঢাকা ত্যাগের কথা ছিল। জেনারেল ফরমান জাতিসংঘের পল মার্ক হেনরি-কে বলেন, ইয়াহিয়ার আশঙ্কা যে, 'দয়া -দাক্ষিণ্যের এসব ফ্লাইটকে ভারতীয়রা প্যারাসুটবাহী সৈন্য অবতরণের আবডাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। পল মার্ক হেনরি আমাদেরকে এ তথ্য দেন। বলেন, এটা হয়তো অসম্ভব নয় যে, ফারমান চেয়েছিলেন বেসরকারি লোকজনকে নিজের মুঠোয় রেখে মার্কিন নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেবেন। এবং এর মাধ্যমে নিজের লোকজন ও সেনাবাহিনীকে রক্ষার সুযোগ করে নেবেন।

অপসারণ কার্যক্রম চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয় ১২ ডিসেম্বর। থেকে যান শুধু ' প্রাণকেন্দ্র' কূটনীতিক ও সাংবাদিকরা। যারা ঢাকা ছাড়তে চেয়েছিলেন, তারা চলে যাবার পর পরই যুগ্মবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল ম্যাককেইনকে এই সতর্ক বার্তাটি পাঠান : 'সংবাদপত্র যদি জানতে চায় সেক্ষেত্রে জানতে চাওয়া বিষয়ের ধরন সম্পর্কে সহকারি প্রতিরক্ষা সচিবের জনসংযোগ বিভাগকে পরামর্শ দিতে হবে এবং নির্দেশের জন্যে অনুরোধ করতে হবে। পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, সংবাদপত্রের প্রশ্নের জবাবে সাধারণভাবে এই লাইনে জবাব দিতে হবে : 'আমরা কোন জাহাজের গতিবিধি নিয়ে আলোচনা করি না। আমাদের পরিকল্পনা আকস্মিকতাকে মোকাবেলার জন্য। এ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে আমেরিকার নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্যে। যদি প্রয়োজন পড়ে জরুরি পরিস্থিতির মধ্যেও উদ্ধার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।' যখন আমি আমার ওয়াশিংটন ' মেরী গো রাউন্ড' পত্রিকায় সতর্ক করে দিয়ে লিখি, টাস্কফোর্স রুশ নৌবহরের মুখোমুখি হতে চলেছে তখন থেকেই ওই ধরনের অজুহাত তোলা হতে থাকে। ' তারা বলেছিল, তারা এসেছে অপসারণের জন্যে। এটা বাজে কথা,' মন্তব্য করেন পল হেনরি মার্ক।

পূর্ব পাকিস্তানিদের জীবন দিয়ে ওয়াশিংটনের আমলারা ভণ্ডামির চূড়ান্ত করেন। ৯ ডিসেম্বর ভোর চারটায় ঢাকা বিমান বন্দর থেকে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী ইসলামি এতিমখানায় বোমা পড়ে। বোমা কয়েকশ' ঘুমন্ত শিশুর প্রাণ কেড়ে নেয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টটিতে এই হৃদয় বিদারক ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় ভারতীয় পাইলটদের দূরভিসন্ধিকে। পরের রাতেও বোমা পড়ে। ফেলা হয় ঢাকার একটি বস্তিতে। এবারও দায় চাপানো হয় ভারতীয়দের কাঁধে। এ ধরনের ঘটনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রোধ সঞ্চার করতে পারে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। এখানকার রহস্যময় নীরবতার মাঝে এসে হাজির হয় আমেরিকান কন্সাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভাকের একটি বার্তা। আর্চার ব্লাডকে (যারা চাকুরিচ্যুত হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি হত্যার প্রতিবাদ করাতে) সরিয়ে বেছে নেয়া হয় তাকে। কেননা, পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবেচনায় তিনি ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ মানুষ। কর্মজীবন তাঁর আগাগোড়াই বৈদেশিক দপ্তরে এবং ঢাকায় আসার কালে অবসর গ্রহণের দোরগোড়ায় এসে যান। তিনি উল্টাপাল্টা কিছু করতে পারেন না। তার ওপর এই বিশ্বাস ছিল পররাষ্ট্র দপ্তরের। ইসলামি এতিমখানায় বোমা পড়ার বিস্তারিত খবর যখন তিনি জানলেন, তার মনোভাবে পরিবর্তন সূচিত হলো। ' রাতের দুর্বত্ত' শিরোনামে তারবার্তা পাঠালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ও রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের কাছে। তার বার্তায় বলা হয় :

প্রমাণের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সহকারি মহাসচিব (পল মার্ক হেনরি) ও আমি বিশ্বাস করি এবং আমাদের দু'জনের বিবেচনায় চূড়ান্ত হিসেব হচ্ছে, গতরাতে ঢাকার অসামরিক এলাকায় বোমা বর্ষণ (এবং ৮-৯ ডিসেম্বর রাতে এতিমখানার ওপর সিদ্ধান্তজাত বোমা বর্ষণ) পরিচালিত করেছে ঢাকা বিমান বন্দরে রাখা পাকিস্তান সরকারের বিমান। এই হামলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে কলংকিত করা।

যে সব প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সেটা নিচের বর্ণনায় দেওয়া গেল :

ক : বোমাবাহী বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ ভারতীয় বিমান বাহিনীর জেট-এর আওয়াজ থেকে লক্ষণীয়ভাবে আলাদা, যা এর আগের হামলা থেকে লক্ষ্য করা গেছে। জাতিসংঘের বিমান বিশেষজ্ঞ তার মতামত প্রদানে বলেছেন, ওই আওয়াজ দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট ছোট ডানাওয়ালা বিমানের আওয়াজের সঙ্গে মিলে যায়। এবং এক প্রকার নিশ্চিত যে, বিমানটি পিয়াগগিয়ো পি—১৩৬—এল। বিমানের অন্তত একটিকে আমাদের সামরিক অ্যাটাশে মাত্র এক সপ্তাহ আগে দেখেছেন ঢাকা বিমান বন্দরে। কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের কর্মচারিরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দশ তলা থেকে, যে হোটেলটি বিমান বন্দরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে দেখেছেন বিমান বন্দর হতে আকাশে বিমান উঠতে এবং বোমা বিস্ফোরণের ঠিক আগ কালে প্রদক্ষিণ করার আওয়াজ শুনেছেন। কনস্যুলেটের আরেকজন কর্মচারিও বিমানের শব্দ শুনেছেন এবং তার বিশ্বাস, বোমা ফেলানোটাও তিনি দেখতে পেয়েছেন। এরপর বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ থেমে যায় এবং ধারণা করা হচ্ছে, বিমান বন্দরের কাছাকাছি নেমে পড়ে। স্থানীয় সিনিয়র কর্মচারিরাও বিমানটি দেখেছেন এবং ভিআইপিদের ব্যবহারের

জন্য বিমান বন্দরে রাখা দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমানটিকে তারা সনাক্ত করেছেন। বলেছেন, উড্ডয়ন কালে কেবিনের বাতি জ্বালানো ছিল।

খ : বিমান থেকে বোমা বর্ষণকালে বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে যে পরিমাণ গোলা ছোঁড়া হয়, তার তুলনায় এক্ষেত্রে কাযর্ত কোন গোলাই ছোঁড়া হয়নি। তবে ছোঁড়া হয় দুটো ট্রেসার বুলেট—বোমা পীড়িত স্থানের কোনাকুনি এক জায়গা থেকে।

গ : বোমা পীড়িত স্থান থেকে উদ্ধারকৃত একটি বোমা, যা এখন ইউএনইপিআরও'র (ইউনাইটেড নেশনস ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ অপারেশন) কাছে রক্ষিত আছে এবং সেটা এমন একটি যন্ত্র বিশেষ, যা দিয়ে অস্থায়ী ব্যবস্থায় বোমা আটকে রাখা যায়। এই যন্ত্রটি কাঠের তৈরি। একটি সমআয়তন বিশিষ্ট মঞ্চ তৈরি করার জন্য তক্তা জোড়া লাগানো হয়েছে পেরেক মেরে। এবং এমন আকার বিশিষ্ট,যা পিয়াগগিও বিমানের কেবিন ও ভাসমানতার মাঝে অবলম্বন থাকতে পারে। এই তক্তার সঙ্গে দু'টো অর্ধবৃত্তাকার ধাতু নির্মিত নাগদন্ড নিচের দিকে মুখ করে দেয়া হয়েছে। নাগদন্ড থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে একটি বেড়ি এবং আছে নানাবিধ পাকানো শক্ত দড়ি। স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পিয়াগগিও বিমান থেকে নিক্ষেপের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থায় তৈরি করা হয়েছে এই যন্ত্র। বোমা নিক্ষেপে গত রাতে এর ব্যবহার হয়েছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বোমা আটকে রাখার যে যন্ত্রটি বোমা পীড়িত স্থানে পাওয়া গেছে সেটা সম্ভবত দূর্ঘটনা।

ঘ : এতিমদের ওপর ৪-৯ ডিসেম্বরের বোমা বর্ষণের সাজুয্যতাই হচ্ছে সিদ্ধান্তের ভিত্তি। আর তা হচ্ছে, বিমানের আওয়াজে অভিন্নতা এবং বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে গোলা বর্ষিত না হওয়া।

এই সিদ্ধান্ত হেনরি জরুরি ভিত্তিতে মহাসচিবকে জানাচ্ছেন। আর আর কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, তা নিয়েও ভাবছেন। তার আশংকা, পাকিস্তান বিমান বাহিনী জাতিসংঘ চত্বরে বোমা ফেলতে পারে। আশংকার কারণ হচ্ছে ইউএনইপিআরও'র অফিসে অস্থায়ী ব্যবস্থার উদ্ভাবিত যে বোমাটি রয়েছে, সেটা অভিযুক্ত হবার পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। বোমা ফেলা হতে পারে প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার জন্যে। তিনি রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকার (হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল ও হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ৫০০ বিদেশী অপসারণের অপেক্ষায় ছিল) নিরাপত্তা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন। তার ধারণা, ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পোক্ত করতে পাকিস্তান বিমান বাহিনী প্রচারের চমকপ্রদ কৌশল হিসেবে এখানেও বোমা ফেলতে পারে। জাতিসংঘ কর্মচারিরা পল মার্ক হেনরিকে প্রমাণসহ ঢাকা কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হতে মানা করেছেন। তাদের আশংকা, এই ধরনের কাজ যিনিই করতে যাবেন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হতে পারে অথবা গুম হয়ে যেতে পারেন তিনি। জাতিসংঘ বোমা আটকে রাখার যন্ত্রটির ছবি নিয়েছে এবং ফেরত দেবার চিন্তা ভাবনা করছে। আর অকেজো বস্তুটি রাস্তায় ফেলে আসবে।

আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে,রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ও রাষ্ট্রদূত বুশ যেন (যদি সম্ভব হয় মহাসচিবের সঙ্গে আলোচনাক্রমে) অবিলম্বে প্রমানসহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি শাহীর সামনে উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবিধান চান এবং তাদেরকে যেন সতর্ক করে দেন যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ যদি করা হয় সেটা প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

যে অভিযোগ আমি করছি, পল মার্ক হেনরিও করছেন, তার গুরুত্ব সম্পর্কে আমি পুরোমাত্রায় সচেতন। আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিবিধানের কথা আমি বলেছি সেটাই হচ্ছে এই বিবেকবর্জিত বর্বরতা বন্ধের একমাত্র উপায়— যে বর্বরতার শিকার হয়ে ইতিমধ্যে ঢাকায় কয়েক শ' এতিম শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

স্পীভাকের রিপোর্ট ফারল্যান্ডকে বিপাকে ফেলে। পাকিস্তানিদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টিকে 'অবস্থাগত প্রমাণ 'বলে উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে তিনি জানান, পরাষ্ট্রসচিব সুলতান খান তাকে বলেছেন, 'তিনি অবিলম্বে তদন্তের ব্যবস্থা করছেন এবং তারপরই তাকে (ফারল্যান্ড) জানাবেন।' এর পরই তিনি ঢাকা থেকে চৌদ্দ শ' মাইল দুরত্বে অবস্থানের সুবিধাগত সুযোগ গ্রহণ করেন এবং নেমে পড়েন তার পাকিস্তানি বন্ধুদের নির্দোষিতা প্রমাণের ওকালতিতে।

ডি আর পি এন (ডিফেন্স রিপ্রেজেনটেটিভ টু পাকিস্তান) জেনারেল চার্লস ই, ইয়েগার ও ডিফেন্স অ্যাটাশে কর্ণেল রবার্ট এ, নোলান বর্ণিত পরিস্থিতিতে পিয়াগগিও বিমানের ব্যবহার প্রশ্নে ঘোরতর আপত্তি তোলেন নিম্নোক্ত কারণে :

ক. দশ মিটার প্রস্থের এবং দশ মিটার গভীরতা সম্পন্ন খাদ সৃষ্টি হতে পারে বড় ধরনের বোমার পতনে (কমপক্ষে ৭৫০ পাউন্ডের বোমা হতে হবে)।

খ. ১০০ পাউন্ডের বোমা বহন ও নিক্ষেপের জন্যে পিয়াগগিও-র কাঠামোগত ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

গ. নিক্ষেপের পর বোমা ফাটাতে দাহ্য পদার্থের সময়মাত্রা ৭শ' থেকে ১ হাজারে উন্নীত করার প্রয়োজন।

ঘ. ৭৫০ পাউন্ডের বোমা ফেলার জন্যে ভূমি থেকে সর্বনিম্ন ১ হাজার ফুট উর্ধ্বে থাকতে হবে নিক্ষেপকারী বিমানকে বোমার টুকরো এবং ক্ষতিকারক পদার্থের আওতা থেকে মুক্ত থাকতে।

ঙ. এমন কী সর্বোত্তম যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও একজন পাইলটের পক্ষে এক হাজার ফুট উঁচু থেকে রাতের বেলায় শহরের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু লক্ষ্য করে বোমা ফেলা সমস্যার ব্যাপার।

ইয়েগার এবং নোলান প্রস্তাব রাখেন :

ক. গর্তটি মাপা হোক এবং অবিষ্ফোরিত বোমাটি যদি পাওয়া যায়, তার আকার পরীক্ষা করা হোক। যেমন, ৫০০ পাউন্ড, ৭৫০ পাউন্ড বা ১০০০ পাউন্ড কিনা, সেটা মেপে চিহ্নিত করতে হবে।

খ. যদি সম্ভব হয়, তা হলে পিয়াগগিও-র কাঠামোগত কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা-ও পরীক্ষা করতে হবে।

তাছাড়া ইয়েগার ও নোলান আরো বলেন, উল্লেখিত এতিমখানায় কোন শ্রেণীর বিমান চার চারটি বোমা ফেলতে পারে এর যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বিমানটি ক্যানবেরা হবে, যেটি আট থেকে দশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছিল,বিমান বিধ্বংসী কামানের নাগালের বাইরে ছিল। এবং ঢাকার তথ্যের ভিত্তিতে দু'জনেই বিশ্বাস করেন যে, পিয়াগগিও'র ওই সময় আকাশে থাকাটা ছিল সম্ভবত কাকতালীয় ব্যাপার।

পিয়াগগিও নিয়ে জেনারেল ইয়েগারের আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৯০ ঘন্টারও বেশি।

জেনারেল ইয়েগার প্রশ্নাতীতভাবে একজন তুখোড় বিমান চালক। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে আকাশে ওড়েন ১৯৪৭ সালে এক্স-১ রকেট বিমান চালিয়ে। কিন্তু এতিমদের ওপর বোমা বর্ষণের ব্যাপরটিতে দৃষ্টি দিলেন না।

ফারল্যান্ড যে ব্যাখ্যা দেন, নিঃসন্দেহে সেটা সহকারি মহাসচিব হেনরিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। নিউইয়র্ক ফিরে আসার পর তার সাথে আমাদের কথা হয়। হেনরি আমাদের বলেন, বোমা ফেলা হয় পর পর তিন রাতে ডিসেম্বরের ৯,১০ এবং ১১- তে। কাঠের তৈরি অদ্ভুত দর্শন যে বস্তুটি তিনি পরীক্ষা করেন, তার ভাষায়, 'স্পষ্টই সেটা বোমা আটকে রাখার একটি অসংস্কৃত যন্ত্র বিশেষ।' আর এতিমখানাটি তার ভাষায় 'দরিদ্র এবং পরিত্যক্ত শিশুদের একত্রে বসবাসের জন্যে কুড়ে ঘরের সমষ্টি। ' তিনি বলেন, 'আমরা পরিষ্কার বুঝতে পাই যে, কেউ একজন ঢাকার বেসামরিক এলাকায় বোমা ফেলছে বেসামরিক লোক হত্যার দায় ভারতীয়দের কাঁধে চাপানোর জন্যে। আমার এখনো এই রকমই বিশ্বাস। কারণ প্রথমত মনে হয়, একটি অদ্ভুত আলো বিমানটির সাথে গিয়ে যাচ্ছে। প্রথম রাতটি ছিল জ্যোৎস্নাস্নাত এবং বিমানের সঙ্গে কোন আলো ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতে হেলিকপ্টারের ঝটপটানি আওয়াজের মধ্য দিয়ে একটি অদ্ভুত সার্চ লাইট মন্থর গতি সম্পন্ন পাখাওয়ালা বিমানের গুম গুম শব্দের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের কোন শব্দও শোনা যায় না। কামান গুলো হয়তো যে কোন ভাবে হোক অকার্যকর ছিল। কিন্তু, যদি বিমানটি ভারতীয়দের হতো, যে কেউই বোমা বর্ষণের জবাবটা আশা করতো।

হোয়াইট হাউসের কোন বক্তব্য পাওয়া গেল না। ইয়াহিয়াকে দেয়া প্রেসিডেন্ট ও কিসিঞ্জারের সমর্থনের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে হোয়াইট হাউস প্রচারের যে কোন সুযোগ ব্যবহারে আগ্রহী ছিল। কিন্তু বাঙালি শিশু হত্যাকে কোন বিষয় করতে উৎসাহী ছিল না। উৎসাহী না হবার কারণ সম্ভবত এই, পাকিস্তানিরা নিজেদের লোকের ওপর বোমা ফেলছে, এ নিয়ে হোয়াইট হাউস কোন উচ্চবাচ্য করতে চায়নি।

ইয়াহিয়ার জন্যে সাহায্য

পূর্ব পাকিস্তান যখন জ্বলছিল, ইয়াহিয়া তখন বেহালার ছড়ে সুর তুলছিলেন। 'তিনি মদ্যপান ভালবাসতেন। এবং আমাকে বলেছেন, তার জীবনে প্রেমের ঘটনা আছে বহু।' ইয়াহিয়ার বন্ধু রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড আমাদের কাছে স্বীকার করেন।

জাতিসংঘের পল মার্ক হেনরি আরো বেশি স্পষ্টবাদী। হেনরি আমাদের বলেন, দিনের সাত ঘন্টাই ইয়াহিয়া অর্ধমৃত থাকতেন। মদে চুর হয়ে দূর্বল থাকতেন দিনমান ভরা। আমাকে বলা হয়েছে যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে অল্পবয়সী—অধিকতর অল্পবয়সী মেয়ে খুঁজতেন তিনি।'

মদ্যপাত্র হাতে ধরা সৈনিক ইয়াহিয়া জানতেন সরবরাহ ও শক্তি বৃদ্ধিতে তার অক্ষমতার কারণে বাংলায় তার সৈন্যদের ওপর নরক নেমে এসেছে। তবু, আশা করেছিলেন অলৌকিক কিছু দেখাতে পারবেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তিনি বলীয়ান ছিলেন যে এই লড়াই চালিয়ে যাবার মনোবল তার সৈনিকদের অটুট আছে। যদিও সংখ্যায় তারা অল্প এবং অস্ত্রের দিক দিয়ে ক্ষীণবল। বেপরোয়া ইয়াহিয়ার কাছে কাশ্মীর অথবা এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের দখল তার জন্যে ছিল মুখ রক্ষাকারী।

আর আর পর্যবেক্ষকরা যা ভেবেছিলেন, তার থেকে ভিন্নতর নমুনা খুঁজে পান ভারতীয় জেনারেলরা তাদের ঘাঁটির ওপর ৩ ডিসেম্বরের পাকিস্তানি হামলা। যেসব ঘাঁটিতে আঘাত হানা হয় সেগুলো ছিল কাশ্মীরে, যুদ্ধের মহড়া চালানো ঘাঁটি। রানওয়ের ক্ষতিসাধনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান এই বিতর্কিত এলাকায় ভারতীয় শক্তিমত্তাকে আঘাত হানে। পাকিস্তানের রণকৌশল নিয়ে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সংশয় তেমন ছিল না। ৭ ডিসেম্বর জেনারেল ওয়েষ্টমোরল্যান্ড বললেন, তিনি আশা করছেন 'পাকিস্তানের প্রধানতম প্রচেষ্টা কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের দিকে ধাবিত হবে।' তার এই ভবিষ্যৎ বাণীতে কেউ আপত্তি তোলেনি।

এ আই ডি'র (এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) পরিচালক মউরিচ উইলিয়ামস ৮ ডিসেম্বরের বৈঠকে প্রস্তাব দেন, পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ বিরতি অর্জন সংক্রান্ত প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের তোলা উচিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি ইউ আলেকসিস জনসন এর প্রতিবাদ করেন। বলেন : 'এই প্রস্তাব

Bangladesh * Liberation War Museum Library

কাশ্মীরের থেকে আক্রমণ পরিচালনায় পাকিস্তানকে বিরত করবে।' পাকিস্তানের কাশ্মীরের দিকে ধাবিত হবার চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণ থামিয়ে দেবার ব্যাপারে কিসিঞ্জার অধিকমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। এমন কী পাকিস্তানি সাফল্যের ব্যাপারেও একটা প্রত্যাশা ছিল। কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে : 'ডক্টর কিসিঞ্জার কাশ্মীরে পাকিস্তানের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার একটা হিসেব নির্ণয় করতে বলেন।'

অথচ পরে প্রেসিডেন্ট নিকসন কংগ্রেসকে বলেন, যদি আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতাম তাহলে দীর্ঘায়িত হতো এবং পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমনের সম্ভাবনা অধিকহারে বৃদ্ধি পেত। তথাপি পরিস্কার যে, যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ায় আমাদের (মার্কিন) ভূমিকা পাকিস্তানকে ভারতীয় ভূখন্ড দখলের চাক্রান্ত থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

ইয়াহিয়া অবশ্য সাহায্যের জন্যে সম্পূর্ণ ভাবে মার্কিনীদের ওপর নির্ভর করেননি। ভারতের জন্যে রাশিয়ার সমর্থন ছিল দৃশ্যমান এবং সম্ভবত এর অতিরঞ্জন ঘটানো হয় পাকিস্তানে চীনের সাহায্য প্রদানের মধ্য দিয়ে। চীন ও পাকিস্তান অনেক ব্যাপারেই একই মতের অনুসারী ছিল। আবার আকাংখাও ছিল কাশ্মীর দখল এবং কিসিঞ্জারের বন্ধুত্ব লাভের।

যুদ্ধ চলাকালীন সিআইএ চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক প্রশ্নে অস্বাভাবিক রকমের সংযম দেখায়। এই গোয়েন্দা সংস্থা ভারতের প্রতি চীনা হুমকির ইঙ্গিত 'প্রথম আবিষ্কার করে পিকিংয়ের পিপলস ডেইলির ৮ ডিসেম্বরের সংখ্যায়। সিআইএ রিপোর্টে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে ভারত যেভাবে তার সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করেছে, একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 'ভারতের প্রতিবেশী একটি দেশ' 'একটি পশ্চিম বাংলা অথবা একটি শিখস্থান সৃষ্টিতে' সৈন্য পাঠাতে পারে। সিআইএ 'র ভাষা অবশ্য অনেকটা কৈফিয়তমূলক ছিল। বলা হয় এই ভাষায়ঃ হুমকিতে অবশ্য এমন কোন ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়নি যে, পিকিং তার সাম্প্রতিক সংযমী নীতি পরিত্যাগ করে পাকিস্তানকে রাজনৈতিক সমর্থন দিচ্ছে এবং সামরিক উপকরণ সরবরাহ করছে।

ইয়াহিয়া তার উচ্চারণে অবশ্য কোন সংযমের ধার ধারলেন না। ১১ ডিসেম্বর তিনি তার নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া নূরুল আমিনকে বলেন যে, সাহায্য এখন আসার পথে। সিআইএ তাদের আলোচনায় আঁড়ি পাতে। সিআইএ'র ভাষ্য অনুযায়ী, ইয়াহিয়া নূরুল আমিনকে বলেন, চৈনিক রাষ্ট্রদূত তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে নেফা অভিমুখে চীনা সেনাবাহিনীর বিচলন শুরু হয়ে যাবে।

সিআইএ রিপোর্টে তুলে ধরা ইয়াহিয়ার চীনা হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত অশুভ আলোচনা ওয়াশিংটনকে মহা উৎকণ্ঠার মধ্যে নিক্ষেপ করে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ পরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ মন্তব্য করে, মনে হচ্ছে চীন ভারতের বিজয় গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আর পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশ্লেষকরা

A-9881

ভবিষ্যতবাণী করেন : 'পরিস্থিতিতে যেখানে সোভিয়েতের পাল্টা বিচলনের ঝুঁকি রয়েছে সেখানে চৈনিকরা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়বে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক সমর্থন দান ও সামরিক উপকরণ সরবরাহের বেশি কিছু করার সম্ভাবনা তেমন নেই। যদি কিছু হয়, চীন ভবিষ্যতে নয়াদিল্লীর ওপর সোভিয়েত প্রভাবের বিপরীতে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হবে। যেহেতু সর্বাত্মক লড়াই শুরু হয়ে গেছে, পিকিং তাই ভারতের বিরুদ্ধে তার নিন্দাজ্ঞাপনকে তীব্রতর করেছে। যুদ্ধ চীনের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখোমুখি করেছে, নিন্দাজ্ঞাপনের ভাষায় এ কথাটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

হেনরি কিসিঞ্জারের টেবিলে আসা একটি নতুন গোয়েন্দা রিপোর্ট ওই আশ্বাসকে ম্লান করে দেয়। সিআইএ রিপোর্ট করেঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দাবির সত্যকার নিশ্চয়তা প্রতিপন্ন করা যায়নি। রিপোর্টে ধোঁয়াটে ভাবে এও যুক্ত করা হয়ঃ 'তবে সম্প্রতি একটি নির্দেশনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণে পরিকল্পনা নিতে পারে।

হংকং-এ চীন বিষয়ক পর্যবেক্ষকরা বললেন : পিকিং প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে নিঃশর্ত রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করেছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান দখলে ভারতের অভিলাষ নিয়ে তাকে অভিযুক্ত করছে আর উত্তেজনায় তিক্ততা বৃদ্ধির দায়িত্ব চাপাচ্ছে সোভিয়েতের ঘাড়ে।

জর্ডান থেকে বিমান প্রেরণ

১৯৭১সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত জানতে পায় যুক্তরাষ্ট্র তার না পছন্দ দেশে সাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে এবং দ্রুতই ব্যাপারটি ঘটতে পারে । তাছাড়া অধিকতর পছন্দের দেশগুলোতেও সাহায্য বন্ধের ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় প্রক্রিয়াটা পুরোপুরি সম্পন্ন হবার নয়।

বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন কংগ্রেস সদস্যদের চাপের মুখে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে নিকসন প্রশাসন পাকিস্তানে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানির নতুন লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সেখানেও ফাঁক থেকে যায়। যেসব অস্ত্র রপ্তানির লাইসেন্স ইতিমধ্যে দেয়া হয়, সেসব ইয়াহিয়ার বাহিনীর জন্য জাহাজে তোলার অনুমতি দেয়া হয়। অস্ত্র রপ্তানির ওই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মার্কিন বিমান বাহিনী পাকিস্তানে ১০৬ মিলিয়ন ডলারের একটি নুতন রপ্তানির নির্দেশ দানের অনুরোধ জানায়। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনডি বিমান বাহিনীর দলিলপত্র নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মুখোমুখি হলে অস্ত্র হস্তান্তর বন্ধ হয়ে যায়। তথাপি ৫৬৩০০০ হাজার ডলার মূল্যের বিমান যন্ত্রাংশ, যেগুলো ইতিমধ্যে সকল উপকরণে সজ্জিত করা হয়, পাকিস্তানে চলে যায়। তালিকা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ১৯৭১ সালের আর্থিক বছরে ৩০ জুনে যার শেষ এই বছরে ২৮৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন সামরিক সরবরাহ পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে জাহাজে তোলা হয়।

যুদ্ধ শুরু হবার পর ভারতীয় বিমান বাহিনী যখন দুই পাকিস্তানের আকাশ নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলে ইয়াহিয়া তখন আরো বিমানের জন্য আমেরিকার কাছে অনুরোধ জানান। ইয়াহিয়ার অনুরোধে জর্ডানের বাদশাহ হোসেন জানতে চান তার অধীনস্থ আটটি জেট বিমান তিনি পাকিস্তানে পাঠাতে পারেন কিনা।

কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য যা কিছু করণীয় তার সবই করতে চান। এর অর্থ যদি হয় কংগ্রেসের বিধান লংঘন করা, তাও। ৬ ডিসেম্বরের ওয়াসাগ বৈঠকে এ ব্যাপারে কিসিঞ্জারের মুখে কথা ফোটে। জর্ডান অথবা সৌদি আরব সেখানকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত সামরিক উপকরণ পাকিস্তানে পাঠাতে চাইলে সেটা বৈধ হবে কী না, জানতে চান তিনি।

পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষে বলেন ক্রিস্টেফার ভ্যান হোলেন। তাকে তিনি নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর সাবকমিটির সামনে হাজির হতে হয় তাকে এবং বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। ভ্যান হোলেন বলেন, 'কোন দেশকে আমাদের দেয়া অস্ত্র তৃতীয় দেশে হস্তান্তরের অনুমতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিতে পারে না। বিশেষ করে শেষপর্যন্ত যখন এর গ্রহীতা হবে পাকিস্তান, যার কাছে অস্ত্র বিক্রি আমরা অনুমোদন করি না। তাছাড়া গত জানুয়ারিতে আইন করে বিধান করেছি যে, আমরা পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করবোনা।

সহকারী পররাষ্ট্র সচিব জোসেফ সিসকো ছিলেন ভ্যান হোলেনের ওপরঅলা। ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় তার সাফল্য রয়েছে। তিনি কিসিঞ্জারকে বিরত করতে চাইলেন কূটনৈতিক যুক্তি বিস্তার করে। বললেন, 'এই ধরনের স্থানান্তর জর্ডানকে দুর্বল করবে এবং জর্ডানীরা বরং কৃতজ্ঞ হবে যদি তাদেরকে আমরা এই ফাঁদ থেকে বাইরে রাখি।' তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই ধরনের অনুরোধে মনে করা যেতে পারে যে, 'পাকিস্তান অধিকমাত্রায় তাপ দগ্ধ হচ্ছে'।

কিসিঞ্জার পাল্টা বললেন, 'প্রেসিডেন্ট চাইতে পারেন এই অনুরোধকে সম্মান করা হোক। ব্যাপারটি প্রেসিডেন্টের সামনে তোলা হয়নি। কিন্তু স্পষ্ট যে, পাকিস্তান পরাজিত হোক, প্রেসিডেন্ট এখনো তা চান না।'

উপ-প্রতিরক্ষা সচিব ডেভিড প্যাকার্ড বললেন 'কী করা যেতে পারে, সেটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।' সিসকো সম্মত হলেন। তবে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু করতে হবে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে।'

ইঙ্গিতটা হচ্ছে এই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বেআইনি অস্ত্র চোরাচালানের পক্ষ হচ্ছে এবং উচ্চস্তরে অবস্থানগত কারণে যেসব কূটনীতিক ব্যাপারটি জানতে পান, তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে হতাশা ব্যক্ত করেন। অন্যরা করিডোরে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট স্বরে শুধু ঠোঁট নাড়েন। বিদেশে উচ্চপদে আছেন এমন কয়েকজন ওয়াশিংটনে তারবার্তা পাঠান।

কিসিঞ্জার অবশ্য তার ভাবনা থেকে সরে এলেন না। ৮ ডিসেম্বরের ওয়াসাগ বৈঠকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'জর্ডানকে আমরা পরিকল্পনার নকশার মধ্যে কীভাবে রাখতে পারি, সেটা নিয়ে ভাবতে হবে। এই কারণে যে, প্রেসিডেন্টকে বিষয়টি নিয়ে বিবেচনার সময় যাতে দেয়া যায়।'

প্যাকার্ড নিজের মতামতে আঁকড়ে ছিলেন। সমস্যাটি নিয়ে আগাগোড়া ভাবেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে,এর পক্ষে জবাব দেবার কিছু নেই। তিনি বলেন 'আমরা জর্ডানকে এমন কিছু করার অনুমোদন দিতে পারি না, যা মার্কিন সরকারই করতে পারে না। যদি যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ১০৪এস জেট না দিতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা জর্ডানকেও দেবার অনুমতি দিতে পারি না। কোন বস্তু যা তৃতীয় একটি দেশে আছে অথচ মার্কিন সরকারের হাতে নেই, সেটা এক ব্যাপার।

কিন্তু ১০৪এস জেট পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যাপারে জর্ডানকে আমরা অনুমতি দিতে পারি না। যতক্ষণ না আমরা জানতে পারছি পকিস্তানিরা সেগুলো সরাসরি আমাদের কাছ থেকে কেনার যোগ্যতা ধরছে কীনা।'

কিসিঞ্জার তার পেশাদারি ভঙ্গিতে পাল্টা বলেন, 'যদি আমরা পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে না দিতাম, আজকের এই সমস্যা সৃষ্টি হতো না। পাকিস্তানে যখন অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করে দেই তখন আসল বিপদ কী হতে পারে সেটা নিয়ে সম্ভবত আমরা প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণে যাইনি।'

'যদি জর্ডানকে এই ১০৪এস বিমান পাকিস্তানে প্রেরণ করতে হয় প্যাকার্ড সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে সেক্ষেত্রে জর্ডানের ওই ঘাটতি পূরণ করতে হবে।'

পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি ইউ, অ্যালেক মিস জনসন বলেন 'পশ্চিমাঞ্চলে মূল যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায়, সেখানে আটটি এফ ১০৪ এস নতুন কোন মাত্র যুক্ত করতে পারবে না। এগুলোকে প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি আদতেই পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের যেতে হয়, সেটা আমাদের জন্যে নতুন বিপত্তি বয়ে আনবে।'

বাস্তববাদি মানুষ প্যাকার্ড বলেন যে, গতিস্মানতার ওপর চড়ে বসে কার্যকর কিছু করা অথবা না করার ব্যাপারটি বিবেচনা করা হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে বাস্তব সমস্যা। তিনি পরামর্শ দেন, 'যদি আমরা জয়ী না হই তবে নিজেদেরকে জড়াবো না। যদি আমরা বুঝতে পারি আমরা হারছি, আমরা নাক গলাবো না। বাইরে থাকার পথ বের করে নেব।'

কিসিঞ্জার আবার বলেন, তিনি চান হোসেনকে পরিকল্পনার মধ্যে ধারণ করতে এবং চান না বাদশাহকে পরিকল্পনার নকশার বাইরে সরিয়ে রাখতে। কিসিঞ্জার নির্দেশ দেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার হোসেনকে এই ইঙ্গিত দিক যে, এ ব্যাপারে তার যে মনোভাব, তাকে আমরা গতানুগতিক বলে মনে করি না।

কিসিঞ্জারের নির্দেশ পরদিনই কার্যকর করা হয়। পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি জন আরউইনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি তারবার্তা প্রেরিত হয় আম্মানে রাষ্ট্রদূত লুইস ডি ব্রাউনের কাছে। তারবার্তায় বলা হয় ঃ আপনি বাদশাহ হোসেনকে বলবেন পাকিস্তানের অনুরোধে যে চাপের মধ্যে তিনি পড়েছেন এবং দায়িত্বকে উপলব্ধি করছেন, আমরা তার প্রশংসা করি। এবং স্বীকার করি সেটা তাকে মারাত্মক পরিস্থিতির সামনাসামনি করেছে। এতদসত্ত্বেও আমরা এমন অবস্থানে নেই যে, তাকে নির্দিষ্ট কোন জবাব দিতে পারি। বিষয়টি মার্কিন সরকারের অতি উচ্চ পর্যায়ের নিরীক্ষাধীন রয়েছে। বাদশাহর জরুরি জিজ্ঞাসার নির্দিষ্ট জবাব দিতে না পারায় আপনাকে যে স্পর্শকাতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা পুরোমাত্রায় সচেতন। আমাদের হয়ে পরিস্থিতির সর্বোত্তম ধারণা আপনি হোসেনকে দেবেন।

আরেকবার পররাষ্ট্র দপ্তর কিসিঞ্জারের বার্তাবাহক হয়। বার্তা নিরীক্ষণে সরকারের 'অতি উচ্চ পর্যায়ে' ব্যক্তি ছিলেন এবং নিরীক্ষক ছিলেন মাত্র একজনই,যিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন, তিনি রিচার্ড নিকসন। কিসিঞ্জারের সুপারিশে প্রেসিডেন্ট ১০টি এফ ১০৪ এস বিমান পাকিস্তানে প্রেরণের জন্য জর্ডানকে অনুমোদন দিলেন। কিন্তু ওয়াসাগ-এর যেসব সদস্য বিমানের চালান প্রেরণ অ-বিজ্ঞচিত বলে মনে করেন, তিনি তাদের পরামর্শকে সম্পূর্ণভাবে অসম্মানও করেন না। সিসকো যেমনটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই মতো চালান প্রেরণ অত্যন্ত গোপনে সম্পাদিত হয়।

১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিলের আগ পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকার মুখ খোলেনি। ওই দিনই সর্বপ্রথম স্বীকার করে যে, জর্ডান পাকিস্তানকে বিমান দেয়। এতদসত্ত্বেও পররাষ্ট্র দপ্তর ধার্মিক সুলভ সততার ভান করে জোরের সাথে বলতে থাকে যে, ঘটনাটি ঘটে আমেরিকার অনুমতি ছাড়াই। এক সরকারি মুখপাত্র বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তা আইনের স্পষ্ট লংঘন।

স্বীকৃতিটা উচ্চারিত হয় অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বাদশাহ হোসেনের তিন সপ্তাহকাল সফর শেষে। সফরে তিনি নিকসনের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে বাদশাহ তার বিমান বাহিনীর জন্য নতুন প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন— যেমনটি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন ডেভিড প্যাকার্ড।

প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে জানান যে, যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে কোন মার্কিন অস্ত্র যায়নি। তিনি বলেন 'নভেম্বরের শুরুতে পাইপ লাইনের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।'

কিন্তু কোন কারণবশত জর্ডান থেকে পাকিস্তানে বিমান প্রেরণের বিষয়টি উল্লেখ করেন না।

কূটনীতি ও প্রচার

তার সরকারি পদটি ছিল জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রেসিডেন্টের সহকারি কিন্তু তার দরজার ওপর নেমপ্লেটে যদি এইরকম লেখা থাকতো :

ড : হেনরি কিসিঞ্জার

পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ-কূটনীতি

পরিচালক, 'যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ প্রচার',— তো অধিকতর নির্ভুল হতো।

কিসিঞ্জার আধিপত্য চালান হোয়াইট হাউসের ভূগর্ভের কক্ষগুলোতে আর কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র বিন্দু ছিল সিচুয়েশন রুম। কক্ষটি নানাবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। এগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন জায়গার যে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন কিসিঞ্জার। কথা বলতে পারতেন তার পরিচালনাধীন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সঙ্গে। এটি একটি ছোট্ট কক্ষ, আয়েশ করে দশজনের বসার মতো পরিসর। ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকের জন্যে টেবিলের চারদিকে বসানো হতো বাড়তি চেয়ার। মুখ্য আলোচকদের সহায়তাকারীদের দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হতো।

হোয়াইট হাউসের জনসংযোগ বিভাগের লোকজনরা দৃঢ়তার সাথে বলেন, কিসিঞ্জার তার প্রিয়পাত্রদের এই বলে তাড়িয়ে ফিরতেন, 'প্রতি আধঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ধমক আসছে যে, আমরা ভারতের প্রতি যথেষ্ট কঠোর হতে পারছি না।' কিসিঞ্জারের অধীনস্থ অনেকেই এই ভেবে আনন্দবোধ করতেন যে, তাদের ওপরঅলা ধমক-ধামকের মধ্যে আছেন। যা-ই ঘটুক, কিসিঞ্জার অনিচ্ছুক কর্মকর্তাদের তার কূটনীতি অনুসরণ করাতে পেছন থেকে ঠেলতেন মন্ত্র জপার মতো করে প্রেসিডেন্টের কথা বলে।

এক পর্যায়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করার কিসিঞ্জারের ইচ্ছায় সুচতুরভাবে অন্তর্ঘাত চালান কর্মকর্তারা। এ সম্পর্কে তিনি যে সজাগ ছিলেন, তা বোঝা যায় ডিসেম্বরের ওয়াসাগ বৈঠকে দেয়া তার নির্দেশনামায়। এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে তিনি ডিসেম্বর মাসের ওয়াসাগ বৈঠকের সমাপ্তি ঘটান। নির্দেশে তিনি বলেন :

> চুক্তির বাধ্যবাধকতা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। একটি চিঠি অথবা একটি স্মারকলিপির বিষয় বস্তুর কথা আমার মনে পড়ছে। তাতে আমাদের সঙ্গে

বিদ্যমান চুক্তিতে ভারতের প্রতি বিশেষভাবে ঝোঁকার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ১৯৬২ সালে আমি পাকিস্তান যাই। সিয়াটোর কথা প্রসঙ্গে এই সময় আকস্মিক ঘটনা মোকাবেলার প্রশ্নে একটি চিঠি অথবা মৌখিক বোঝাপড়া সম্বলিত একটি বিষয় এসে যায়। চিঠিটি সম্ভবত ছিল প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট, প্রেসিডেন্ট সংক্রান্ত। এটি ছিল ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ব্যাখ্যা সম্বলিত চিঠি।

পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনীতিকরা ঘর্মাক্ত হয়ে যান সিয়াটো চুক্তি ও গোপন সমঝোতার ব্যাখ্যা নির্ণয়ে। তারা এই বিষয়ে একমত হন যে, চুক্তি এবং গোপন সমঝোতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো যথাযথ অর্থবোধক করার মতো দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ নয়। কিন্তু তারা চুক্তি নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চুক্তি এই অর্থ করে, যদি পাকিস্তানে কোন কমিউনিস্ট দেশের আক্রমণ পরিচালিত হয় সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসতে বাধ্য। এই ব্যাখ্যা পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে পরিণত হয়ে যায় এবং এটাকে তারা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানোর ঘুটি হিসেবে মন্ত্রের মতো জপতে থাকে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিরপেক্ষ থাকতে চাইলেন না। হয়তো বা কিসিঞ্জার তার পক্ষপাতিত্বকে উসকে দিয়েছিলেন, হয়তো বা নয়। ভারত-পাকিস্তান সংকটকালের পুরোটা সময় যারা কিসিঞ্জারের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের ধারণা, ভারতের প্রতি তিনি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি ভারত বিরোধী কার্যক্রম তোলার ক্ষেত্রে সাধারণত সতর্ক থাকতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে কড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ যখন তিনি দেন, সেই সময় ওয়াসাগকে বলেন: 'প্রেসিডেন্ট চান না ৯৯ মিলিয়ন ডলারের ঋণের অধীনে আরও ঋণপত্র দেয়া হোক। তিনি এও চান যে, পাবলিক ল ৪৮০'র অধীনে মঞ্জুরীকৃত ৭২ মিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রদান বন্ধ হোক।' পাবলিক ল ৪৮০ প্রকল্পকে বলা হয় শান্তির জন্য খাদ্য। এই আইন মার্কিন সরকারকে তার উদ্বৃত্ত খাদ্য অভাব পীড়িত দেশে বিতরণের অনুমতি দিয়েছে। নিসকন-কিসিঞ্জার নীতিবাক্যে শান্তির জন্য খাদ্য যুদ্ধ সাধনীতে পরিণত হয়।

কিসিঞ্জারকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, এই আটুনি বিরূপ প্রচারণার জন্ম দিতে পারে। তিনি এর জবাব দেন সহজ ভঙ্গিতে। বলেন, 'এটা প্রেসিডেন্টের) আদেশ । কিন্তু এ নিয়ে আবার আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসবো। যদি তিনি জিজ্ঞেস করেন তো বলতে পারি পুরো অর্থনৈতিক কার্যক্রমটি আমরা পর্যালোচনা করছি এবং উপমহাদেশের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নতুন সাহায্যের অনুমোদন দান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।'

আরেক সময় কিসিঞ্জার নিজের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে খোলামেলা হয়ে যান। ভারতীয় বিমান ঘাঁটির ওপর সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বিমানের হামলার খবর হেলমস যখন কিসিঞ্জারকে দেন তখন তাকে (হেলমসকে) তিনি চাপ দিতে থাকেন বিস্তারিত তথ্যের জন্যে, যাতে পাকিস্তানি কার্যক্রমের দায়দায়িত্ব ভারতের

ওপর চাপানো যায়। 'ভারতীয়রা কী তাদের (পাকিস্তানের) কোন ভূখণ্ড দখল করেছে? এটাই সম্ভব যে ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম, হামলা চালায় এবং পাকিস্তানিরা সন্ধ্যার আগে যতটুকু করার করে', কিসিঞ্জার বলেন।

একই দিনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র চার্লস ব্রে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হন কিসিঞ্জারের বার্তা পরিবেশনায়। 'পাকিস্তানে বারংবার ভারতীয় আক্রমণ'—এর কথা বলে তিনি ভারতে ১১.৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিমান যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সজ্জিতকরণ উপকরণ রপ্তানি বাতিলের ঘোষণা দেন। কিন্তু "প্রজেক্ট স্টার সাফায়ার" নামে ভারতের ওপর চৈনিক বিমান হামলা সতর্কীকরণ রাডার প্রকল্পের জন্যে নির্ধারিত ইলেকট্রনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সজ্জিতকরণ উপকরণের বিষয় তার বক্তব্যে আনেন না।

মার্কিন কূটনীতি ও ইয়াহিয়ার আকাঙ্ক্ষাকে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে তার প্রতিটি পদক্ষেপে তুলে ধরে। জাতিসংঘে সে নিজের একটি সদুদ্দেশ্যের জন্ম দেয়, যা অনুমান সিদ্ধ। এই সংস্থায় রয়েছে তার একটি প্রচারণা ফোরাম। কিসিঞ্জার সংস্থাটিতে সংগীত সৃষ্টির জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সংগীত সৃষ্টিতে প্রথম বেহালা বাদক হিসেবে হাজির করেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি আরউইন ওয়াসাগকে জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। বলেন 'মন্ত্রী জাতিসংঘে মার্কিন অবস্থান তৈরিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছেন।'

কিসিঞ্জার বলেন, 'প্রেডিসেন্ট এই ধরনের পদক্ষেপের পক্ষে রয়েছেন। যে মুহূর্তে আমরা কোন বড় ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছি তখন থেকেই তিনি এর অনুকূলে এসে যাবেন। যদি জাতিসংঘ এই ধরনের পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে আসছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের গ্যারান্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাও নিরর্থক।"

' রাষ্ট্রদূতের (পাকিস্তানি) সঙ্গে আলাপের পর আজ বিকেলেই আপনার জন্যে একটি সুপারিশ তৈরি করতে পারবো; সিসকো বলেন, 'রাষ্ট্রদূতকে তার দেশে বার্তা পাঠানোর সময় দেয়ার জন্যে আমরা আগামীকাল পরীক্ষামূলকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহবান করতে পারি।'

মাঠে নামতে হবে আমাদেরকে,' কিসিঞ্জার দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট আমাকে দোষারোপ করছেন আর নিদোর্ষ রয়ে যাচ্ছেন আপনারা।"

'এটাই সর্বোত্তম,' ছাগ শিশুর তারল্যে বলেন সিসকো।

জতিংসঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যে আবেদনটি জানাবেন, এবার তার প্রতি মনোযোগ দেন কিসিঞ্জার। তিনি অভিযোগ করেন, 'বুশের বক্তৃতার জন্যে তৈরি আগেরকার খসড়াটি অনেক বেশি নিরপেক্ষ।'

'পুনরায় নিরীক্ষার জন্যে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমরা দেখা করবো এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাকে রিপোর্ট করবেন। বুশ যে বক্তৃতাটি করবেন, তার

খসড়াটি ঠিকঠাক করে আমরা সেটাকে হালনাগাদ করবো,' সিসকো বলেন। সিচুয়েশন রুমের ভাষ্য অনুযায়ী হালনাগাদ' অর্থ ঝুকে পড়া এবং ' নিরপেক্ষ না থাকার' অনুমোদনসহ নতুন করে লেখা।

'আমরা বলতে পারি যে, আমরা রাজনৈতিক নিস্পত্তির পক্ষে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের আসল কাজ হচ্ছে সামরিক কার্যক্রমকে বাধা দেয়া,' কিসিঞ্জার বললেন।

শান্তির আহ্বান সম্বলিত মস্কো ও নয়াদিল্লীতে প্রেরিত নিকসনের বার্তা, যা অন্যের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দেয়ার একটি কুশলী পদক্ষেপ, তার কথা উল্লেখ করে সিসকো বলেন, 'আমরা কোসিগনি কিংবা মিসে গানধরি কাছ থেকে কোন জবাব পাই নি।'

'আমরা কী পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছি?' অসংলগ্নভাবে বলে ওঠেন উইলিয়ামস।

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার কথা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তাকে এখনো পাকিস্তান সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে বলা হয় নি,' কিসিঞ্জার উপদেশ দানের সুরে বলেন।

'ভারতবাসীদের পক্ষ হয়ে যদি আমরা কাজ করি, আমরা বলতে পারি পাকিস্তান পরিস্থিত নিয়েও আমরা পর্যালোচনায় রয়েছি,' সিসকো তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বলেন।

ওয়াসাগ বৈঠকের অনেকগুলোতেই কিসিঞ্জার উচুস্তরের কূটনীতিক ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সামনে এমন ঢংয়ে কথা বলেন তাতে মনে হবে, তিনি যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাবাগোবা ধরনের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছেন। বৈঠকের কার্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ তার কিছু মন্তব্যে এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যেন তিনি ন্যায্যটাই বলেছেন। কিন্তু সিসকোর মতো ব্যক্তিরা,— যারা ভাবতেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত কিছুটা কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা,— তাদের প্রতি তিনি রূঢ় ছিলেন।

'পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়াটা কঠিন হবে যদি আমাদেরকে প্রতিটি ভারতীয় পদক্ষেপের সঙ্গে পাকিস্তানি পদক্ষেপকে মিশ খাওয়াতে হয়,' কিসিঞ্জার বলেন, 'দি আপনার সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, আমি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত পেয়ে যেতে পারি।'

পরদিন সকালের ওয়াসাগ বৈঠকেও কিসিঞ্জার একই রকমের বিদ্বেষী মেজাজে ছিলেন। হেলমস যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'ভারতীয়রা চারদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং তারা আটটি পাকিস্তানি বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করেছে। তথাপি মিসেস গান্ধী একে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশক বলছেন না। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া তার ভাষণে 'ভারতের সঙ্গে 'শেষ যুদ্ধ" করার এবং শত্রুকে তাড়িয়ে দেয়া ও ধ্বংস করার কথা বলেছেন।'

কিসিঞ্জার যা চাইছিলেন, সেদিকেই এগিয়ে যান। বলেন, 'যদি ভারতীয়রা সর্বাত্মক হামলার ঘোষণা দেয় তবে আজ বিকেলে জাতিসংঘে আমাদের যে বিবৃতি যাবে, তাতে সেটার প্রতিফলন থাকতে হবে।'

পররাষ্ট্র দপ্তরে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সহকারি সচিব স্যামুয়ের ডি পালমা উল্লেখ করেন যে, দু'পক্ষই বাকবিনিময়ে কঠোর। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া ও মিসেস গান্ধী, দুজনেই যুদ্ধং দেহী বাক্য বিনিময় করছেন। আমাদের বিবৃতিতে যদি মিসেস গান্ধীর কথা আনি তো ইয়াহিয়ার কথা কী আনতে হয় না।'

কিসিঞ্জার রেগে গেলেন। এবং ক্রোধের প্রকাশও ঘটালেন সেই সব ব্যক্তিদের প্রতি, যারা সৎ হবার চেষ্টা করেন। কারণ, তারা বিশ্বাস করেন সাফল্য পেতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই কিছু না কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। 'প্রেসিডেন্ট বলেছেন, হয় আমলাতন্ত্র এর ওপর সঠিক বিবৃতিটা তুলে ধরবে, না হয় হোয়াইট হাউসকেই করতে হবে,' কিসিঞ্জার সক্রোধে বললেন, 'নিজরে দেশ রক্ষায় ইয়াহিয়ার দেয়ার বক্তব্যে আপত্তি তুলতে পারে কি জাতিসংঘ?'

'জাতিসংঘে আমরা বিপাকে পড়বো,' সতর্ক করে দেন ডি পালমা, ' কারণ যেসব দেশ আমাদের সঙ্গে থাকবে তারা চাইবে না ততটুকু পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকতে, যতখানি আমরা ঝুঁকবো।'

ডি পালমা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের ওপর ক্ষিপ্ত হন কিসিঞ্জার। কেননা, একে তিনি ধৃষ্টতা বলে মনে করেন। ডি পালমার প্রতি যে হম্বিতম্বি করেন, তার মধ্য দিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরকেও তার রুষ্ট মেজাজ দেখান। বিশেষ করে উপ-সহকারি সচিব ভ্যান হোলেন ক্রিস্টোফার কিসিঞ্জারের কোপানলে পড়েন। তিনি এক সংবাদ ব্রিফিং-এ বলেন যে, পরিস্থিতিকে প্রফেসর পক্ষপাত শূন্য দৃষ্টিতে দেখছেন। কিসিঞ্জার যখন তার জার্মান উচ্চারণ ভঙ্গিতে গজরাচ্ছিলেন, ভ্যান হোলেন তখন নীরবে বিরস বদনে বসেছিলেন। কিসিঞ্জার বলছিলেন, 'যিনিই এই পরিস্থিতিতে পশ্চাদমুখী হবেন, প্রেসিডেন্টের ক্রোধ তিনি ডেকে আনবেন। অনুগ্রহ করে চেষ্টা করুন এবং প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার অনুসরণ করুন। প্রেসিডেন্ট এই বিভ্রমে আছেন যে, তিনিই নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং এই নয় যে, যতটা অগ্রগতি হচ্ছে ততটাই তাকে জানান হচ্ছে।'

সংঘর্ষ বন্ধ করা নয়, অন্য কিছু ছিল কিসিঞ্জারের মনে। তিনি তার পরবর্তী নির্দেশে বলেন : 'পাকিস্তানিদের আমরা বলেছি আমরা বক্তব্য রাখবো। আমাদের এগোতে হবে এবং অন্য দেশ কী করতে চাইছে, সেটা অগ্রাহ্য করেই এগোতে হবে। যে কোনভাবেই হোক, আমাদের বিবৃতিতে আমাদের অবস্থান তুলে ধরতে হবে। এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করার, যদিও তোড়জোড় করতেই দু'সপ্তাহ আমরা পার করে দিয়েছি। সবাই জানে এর ফল কী দাঁড়াবে এবং সবাই জানে ভারত শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবে। রাজনৈতিক সমাধানের খুঁটিনাটি বিবেচনাধীনে নেবার 'আগেই' যুদ্ধ বিরতি এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের ওপর আমরা জোর দিতে চাই।'

আতংকিত ডি পালমা জাতিসংঘে আমেরিকার কার্যধারা সম্পর্কে বিনয়াবনত হয়ে বলেন, 'যদি এই সিদ্ধান্ত মতে অন্যরা আমাদের সঙ্গে বলতে চায়, তো চমৎকার। নইলে সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা এককভাবেই চলবো।'

কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সুফল পাবার আশায় কিসিঞ্জার তখনো এগিয়ে চলেছেন। তিনি বললেন : 'সোভিয়েত ভেটোর কারণে নিরাপত্তা পরিষদে কিছুই ঘটবে না। পুরো ব্যাপারটা হবে একটা প্রহসন।' তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সাধারণভাবে প্রসঙ্গ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিষয়টি টেনে এনে এগিয়ে যাবে।

তিনি বললেন : 'কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই কোন নির্দিষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করবো না কিংবা প্রস্তাব দেব না। যেমন, মুজিবের মুক্তির ব্যাপারটি।'

কিসিঞ্জারের কৌশল অন্তত একবার প্রেসিডেন্টকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। নিকসন এবং তার সফর সঙ্গীরা আজোর্স-এ ফরাসী প্রেসিডেন্ট পমপিডুর সঙ্গে বৈঠক করে ফিরে আসছিলেন ওয়াশিংটনে। বিমানে পাঁচজন সাংবাদিকের একটি দলের সঙ্গে মিলিত হন। নিয়মানুযায়ী এ ধরনের খবরের সূত্র বেনামী থাকেন এবং খবরের সূত্রকে 'উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক সূত্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

বিমান ভূমিতে অবতরণ করার পর 'ওয়াশিংটন পোস্ট' সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা বেনামী সংবাদ সূত্র নিয়মের প্রতি সম্মান দেখাবেন না এবং কিসিঞ্জারের নাম উল্লেখ করবেন সংবাদের সূত্র হিসেবে। 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর খবরানুযায়ী কিসিঞ্জার বলেন, যদি রাশিয়া ভারতের অগ্রগতি রোধে প্রভাব না খাটায় তবে প্রেসিডেন্ট তাঁর পরিকল্পিত ১৯৭২ সালের মে মাসের মস্কো সফরসূচি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' কিসিঞ্জারের ভাষ্য তুলে দিয়ে রিপোর্ট করে, এই পুনর্বিবেচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের দিকেও ধাবিত হতে পারে।'

ওয়াশিংটনের বাইরে অ্যানড্রু বিমান ঘাঁটিতে বিমানটি অবতরণ করলে বিমানে আসা সাংবাদিকরা মাঝ আকাশে পাওয়া প্রেস ব্রিফি-এর কপি অপেক্ষমাণ সাংবাদিক সহকর্মীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এবং মুখ আটা খামে ভরা ব্রিফিং-এর আরেকটি ভাষ্য প্রেস এসোসিয়েশনের বার্তা প্রেরকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

এ খবরে হোয়াইট হাউসের তথ্য সচিব রোনাল্ড জিগলার সংবাদদাতাদের ডেকে পাঠান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের কোন সরকারি কর্মকর্তা এই রকম পরামর্শ দেন নি বা পরামর্শ দেবার মনস্থও করেন নি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠেয় শীর্ষ সম্মেলন বাতিলের কথা ভাবা হচ্ছে।'

হেনরি কিসিঞ্জার অনেক বেড়ে গিয়েছিলেন।

বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায়

পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন হোয়াইট হাউসে তার উচ্চারিত শব্দাবলীর মধ্য দিয়ে এমন আচরণ দেখান— যেন তিনি বৃহৎ শক্তি উদ্ভূত সংকটে পড়েছেন। দীর্ঘ সময় যাবৎ তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। আমেরিকার বিশাল সামরিক শক্তির প্রদর্শনীতে নামার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যখন নেন তখন তিনি অতিকথন করেন।

তার কর্মধারা আমেরিকাকে বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায় এনে হাজির করায়,— যে যুদ্ধ রাশিয়া ও চীনকে জড়িত করতো। বস্তুত যুদ্ধ এত কাছাকাছি এসে যায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এত বিস্তৃত ছিল, যা সংবাদপত্র ও জনসাধারণের বোধে আসে নি। পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশ্লেষকরা আশ্বস্ত করেন যে, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে রাশিয়া ও চীন আসবে না। বস্তুত দু'পক্ষই নীরবে তৈরি হচ্ছিল।

দু'পক্ষ পরস্পরের মোকাবেলায় নিঃশব্দে সমর প্রস্তুতি শুরু করে। কিসিঞ্জার যখন হোয়াইট হাউসের আমলাদের বকাঝকা করছিলেন, ঠিক তখনই রাশিয়া তার শক্তিমান ভারত মহাসাগরীয় নৌবহরকে প্রস্তুত করছিল। ৩ ডিসেম্বরে তিনটি সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ, একটি মাইন সুইপার, একটি নৌবাহিনী তেল ট্যাংকার ও ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে নিক্ষেপক ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত একটি ডেষ্ট্রয়ার মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। তাদের গতিবিধি নজরে আসা সত্ত্বেও আমেরিকান গোয়েন্দা বিভাগ তেমন নিবিষ্ট মনোযোগ স্থাপিত করে না। রুশ জাহাজগুলো ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের মধ্যবর্তী দীর্ঘ পাঁচশ' মাইল জলপথে স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল। মস্কোর নির্দেশ অনুসারে পশ্চিমাভিমুখী অগ্রসরমান নৌবহরের প্রতি কেউই তেমন গুরুত্ব দেয় না। রুশী জাহাজের গতিবিধি ৮ ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের কাছে তেমন আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত হতে পারে নি। ওই দিনই গোয়েন্দা বিভাগ আবিষ্কার করে যে, অগ্রসরমান জাহাজগুলো ভারত মহাসাগরে অবস্থানরত জাহাজের বদলি দিতে যাচ্ছে না— যাচ্ছে শক্তি বৃদ্ধি করতে। রুশ বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আড়ি পাতায় জানা যায়, এই তিনটি জাহাজ সিংহল (শ্রীলংকা) থেকে পাচশ' মাইল পূর্বে আছে এবং বঙ্গোপসাগরের দিকে মুখ করে উত্তরমুখী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

এগুলো নিয়ে মোট ষোলটি সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ রণাঙ্গনের পরিমিত দূরত্বে এসে যায়। একটি মাইন সুইপার ও একটি তেল ট্যাংকার বঙ্গোপসাগরের বিপরীত পাড় দিয়ে উত্তরাভিমুখে ধাবমান ছিল। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি নৌবাহিনী তেল ট্যাংকার ও একটি ফাঁক— পূরক সহায়ক জাহাজ ছিল (যে জাহাজ দুই জাহাজের মধ্যবর্তী ফাঁক পূরণ করে) ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কাছাকাছি জায়গায়। এগোচ্ছিল পশ্চিমমুখী হয়ে আরব সাগরের দিকে। আরেকটি ফাঁক-পূরক সহায়ক জাহাজ করাচির দক্ষিণে আরব সাগরে নোঙ্গর ফেলে অবস্থান নেয়। তৃতীয় আরেকটি আরো দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল। রাশিয়া প্রায় একডজন ফাঁক পূরক জাহাজের অধিকারী। সম্ভবত ফাঁক পূরক জলযানকে অনুসরণ করার জন্যে রুশীরা এগুলো নির্মাণ করে। প্রতিটি জাহাজ বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি এবং আড়ি পাতাতে অতিশয় উত্তম কাজ দেয়। রাশিয়ার একটি ট্যাংক অবতরণ জাহাজ একটি মেরামতি জাহাজ, একটি ডিসটিলিং জাহাজ এবং একটি এফ শ্রেণীর সাবমেরিন (ডিজেল চালিত আক্রমণকারী আধুনিক সাবমেরিন) যৌথ অপারেশনে নিয়োজিত ছিল এডেন উপসাগরের উত্তর পূর্ব মোহনায়। একটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি বাণিজ্যিক তেল ট্যাংকারও সেদিকে ধাবমান ছিল। আরেকটি তেল ট্যাংকারও এডেন উপসাগরের মোহনার দিকে এগোচ্ছিল। একটি মাইন সুইপার ছিল ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে। দ্বিতীয় আরেকটি মেরামতি জাহাজ ছিল পারস্য উপসাগরে।

এহেন নৌশক্তির পরিমাণেও সন্তুষ্ট ছিল না সোভিয়েত ইউনিয়ন। আরো তিনটি জাহাজ পাঠায়,— একটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত হালকা ক্রুজার, একটি নৌবাহিনী তেল জাহাজ ও একটি জে শ্রেণীর সাবমেরিন (ডিজেল চালিত, জাহাজ থেকে জাহাজে নিক্ষেপক চারটি ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত) মালাক্কা প্রণালীর দিকে। ৮ ডিসেম্বরে যখন সেগুলো দৃষ্টিগোচরে আসে, দেখা গেল, তারা জাপান সাগরের দক্ষিণ বরাবর অতিক্রম করে যাচ্ছে পূর্ব চীন সাগরের দিকে। এছাড়া আরো একটি সাবমেরিন তাদেরকে অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছিল।

চৈনিক সক্রিয়তার ইঙ্গিত প্রথম আবিষ্কৃত হয় হিমালয় অঞ্চলে।

কর্ণেল মেলভিন হোলস্ট ছিলেন নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে মার্কিন ডিফেন্স অ্যাটাশে। ১০ ডিসেম্বর শেষরাতে ভারতীয় অ্যাটাশে তার বাসভবনে আসেন। তিনি জানতে চান তিব্বতে চৈনিক সামরিক কার্যক্রম সম্পর্কে তার কাছে কোন তথ্য আছে কীনা। পরে হোলস্ট ওয়াশিংটনে তারবার্তা পাঠান। তাতে বলেন : 'ভারতীয় অ্যাটাশেকে জরুরি ভিত্তিতে চৈনিক কার্যক্রম সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে বলা হয়। তিব্বতে সামরিক কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ রকম একটি খবর ভারতীয় হাই কমান্ডের কাছে আছে।

একই দিন সন্ধ্যায় এক নৈশ ভোজে রুশ অ্যাটাশে, নাম লোগিনভ, তিনি হোলস্টের কাছে চৈনিক সামরিক সক্রিয়তা সম্পর্কে জানতে চান। হোলস্ট রিপোর্ট করেন : 'লোগিনভ তাকে বলেছেন যে, তিনি ৮ অথবা ৯ ডিসেম্বর কাঠমুন্ডুতে

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সামরিক অ্যাটাশে চাও কুয়াং চিহ'র সঙ্গে দেখা করেন এবং চাওকে পরামর্শ দেন যে, যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারটিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অতিশয় আগ্রহী হওয়া উচিত হবে না। তাতে ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটাবে। এবং তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্র আছে, যা দিয়ে তারা ইত্যাদি ইত্যাদি...।'

হোলস্ট তার তারবার্তায় আরো উল্লেখ করেন তিনি ' বিশ্বাস করেন যে, ভারত পাকিস্তান সম্পর্কিত ওপরের ওই খবর ডিফেন্স অ্যাটাশের কাছ থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টা মাত্র নয়। রুশ এবং ভারতীয় দূতাবাসে উদ্বেগ বাড়ছে এই কারণে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন হস্তক্ষেপ করতে পারে।"

ক্রেমলিনের উর্ধ্বতন মহলের অনেকেই চান নি ভারতের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপে চীনকে বিরত রাখতে। মস্কো থেকে প্রেরিত গোয়েন্দা বার্তায় সতর্ক করে দেয়া হয় এই বলে যে, কট্টরপন্থীরা মনে করেছে চীন অগ্রসর হবে। এটা তাদের জন্যে এমন একটি সম্ভাবনাময় পরিকল্পনাকে সক্রিয় করে তোলার সুযোগ এনে দেবে, যা দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু উচ্চ পর্যায়ের সমর কুশলীরা লালন করে আসছেন। কিন্ত ক্রেমলিন নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ ও অ্যালেক্সি কোসিগিন সেটা বাস্তবায়িত হতে দেন নি। পরিকল্পনাটি হচ্ছে লপ নর-এ আগবাড়িয়ে গিয়ে আঘাত হানা।

চীনের সিনকিয়াং প্রদেশের এই লেক লপ নর একটি বিস্ময়কর হ্রদ। অদ্ভূত এর ভূপ্রকৃতি। হ্রদের এক প্রান্তের পানি মিষ্টি, সুপেয়। আরেক প্রান্তের লবণাক্ত। এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত এখানে মনুষ্য পদপাত বলতে পড়তো শুধু লপনিক উপজাতীয়দের। তারা মাঝে মধ্যে আসতো মাছ ধরতে।

সর্বশেষ সামরিক মানচিত্রে চোখ বোলালে নজরে আসে একটি সড়ক। দক্ষিণ থেকে এগিয়ে গেছে হ্রদের দিকে। কিন্তু হ্রদের পাড় থেকে কুড়ি মাইল আগেই গেছে শেষ হয়ে। মহাশূন্য থেকে তোলা গোপন আলোকচিত্রে দেখা যায়, সেখানে আরো কয়েকটি সড়ক রয়েছে কিন্তু মানচিত্রে আসে নি। চৈনিক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা প্রায়শই লপ নর—এ আসা যাওয়া করেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে, ১৮ নভেম্বর তারা একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এটা হবে তাদের ত্রয়োদশ বিস্ফোরণ। জানুয়ারির ৭ তারিখে ফাটানো হবে আরেকটি। সম্ভবত এই কর্মচাঞ্চল্য ধরা পড়ে সোভিয়েত উপগ্রহে। অন্যান্য ঘটনাবলী যেমন লক্ষ করা হয়, চীনের আর আর বিজন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি করা হয় উপগ্রহের মাধ্যমে— এটাও ধরা পড়ে সেই একইভাবে। চৈনিক পারমাণবিক হুমকি ৬০০ থেকে ১০০০ মাইল পাল্লার মধ্যে সীমিত। কিন্তু প্রযুক্তি প্রয়োগে উদ্ভাবন করা হয়েছে নতুন একটি অস্ত্র, ঘন-ইন্ধন রকেট। পাল্লা ২৫০০ মাইল। এই ক্ষেপণাস্ত্র মস্কোকে চৈনিক মিসাইলম্যানদের নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছে।

ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে সোভিয়েত সমরনায়করা তাদের নিরাপত্তার প্রতি এই হুমকির বাস্তবে রূপ নেয়ার আগেই বিনাশ করার কথা বলেন। সমরনায়করা যুক্তি

দেখান, পদাতিক বাহিনীর পক্ষে সিনকিয়াং দখল করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অন্যদিকে বিমান হামলায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আণবিক ও রকেট নির্মাণ প্রকল্পকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে।

রুশ নেতারা তাদের পদাতিক ও বিমান বাহিনীকে সিনকিয়াং সীমান্ত বরাবর অবস্থান গ্রহণের জন্য অগ্রসর করান। রুশ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকরা চৈনিক লক্ষ্য বস্তুর প্রতি তাদের ক্ষেপণাস্ত্র তাক করার নির্দেশ পায়।

ইতিমধ্যে চীনারা হিমালয় অঞ্চলে তাদের সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রাখে। মার্কিন গোয়েন্দা উপগ্রহ চৈনিক রেডিও বার্তা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে কয়েকটি ছিল বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিআই এ রিপোর্ট করেঃ ' তিব্বত ও পশ্চিম চীনের জন্য একটি প্রান্তীয় আবহাওয়া কেন্দ্র ৮ ও ৯ ডিসেম্বরে সীমান্ত বরাবর সড়ক ও সংলগ্ন এলাকা সমূহের আবহাওয়া রিপোর্ট প্রতি ঘণ্টা অন্তর পিকিংয়ের এগারটি বেসামরিক আবহাওয়া অফিসে পাঠাচ্ছে। আবহাওয়া বিমান চালনার উপযোগী কীনা, রিপোর্টে এরই বিবরণ দেয়া হচ্ছে।'

সিআই এ মন্তব্য করে : 'এই এলাকার আবহাওয়া রিপোর্টের অবিরাম প্রেরণকে অস্বাভাবিক বলে বিবেচনা করতে হয়। এবং এটাকে সতর্কতামূলক অবস্থার নির্দেশ করে।' ২১ নভেম্বর পর্যন্ত আকাশ ছিল পরিষ্কার। তুষারপাত হয় নি। চীন-ভারত সীমান্ত বরাবর ১০০০০ থেকে ১২০০০ ফুট উঁচু ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছিল শূন্য ডিগ্রির নিচে। তিব্বত থেকে ভারতীয় সীমান্ত অভিমুখী সকল প্রধান প্রধান সড়কগুলোর গিরিপথ ছিল তুষার মুক্ত।

সিআই এ তার রিপোর্টে আরো একটি অশুভ ব্যাপারের ইঙ্গিত দেয়। সেটা হচ্ছে, সিআই এ তার রিপোর্ট বলে : কয়েক মাস যাবৎ তিব্বতে 'যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ্য' করা গেছে। তিব্বতের ইয়াং তুং-এ অবস্থানরত ৫৩ তম স্বতন্ত্র পদাতিক ডিভিশনের ১৫৭ তম পদাতিক রেজিমেন্টের সৈনিকদের ডেকে পাঠানো হয়েছে ' জরুরি মিশন' পালনে।

ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তে যুদ্ধ প্রতিরোধক হিসেবে রয়েছে তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-নেপাল, সিকিম, ও ভুটান। চৈনিকরা তিব্বতের উত্তর প্রান্তের অবস্থান থেকে সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে ঠোকর মারছিল।

নয়াদিল্লীতে রুশ রাষ্ট্রদূত নিকোলাই পিগভ ভারতীয় কর্মকর্তাদের চৈনিক আক্রমণ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন না হতে বলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি ঘটনা ঘটেই যায়, সেক্ষেত্রে ' রাশিয়া সিনকিয়াংয়ে ভিন্নমুখী,' কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সব রিপোর্ট যখন রিচার্ড নিকসন পেয়ে যাবেন তখন ধীর সতর্কতার সঙ্গে নেমে যাবেন পূর্ব পাকিস্তানের ইয়াহিয়ার দুর্বল হাতকে শক্তিশালী করতে। কিন্তু মার্কিন জনগণের কাছ হতে বিশ্বশান্তির প্রতি এই হুমকিকে আড়াল করে রাখা হয় এবং একই সময় 'শান্তির এই রাজপুত্রের' জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট মনস্থ করেন, ভারতীয় ও রুশদের জন্যে বঙ্গোপসাগরে বড়দিনের পার্টি আয়োজনের যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, তা জনগণের কাছ থেকে আড়াল

করে রাখবেন। ভারত মহাসাগরে একটি মাত্র উভচর বিমান ও দুটো পুরোনো যুদ্ধ বিমান ছিল মার্কিন নৌবাহিনীর। বৃটিশ নৌবাহিনী প্রত্যাহারের পর এই অঞ্চলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, সেটা পূরণে রাশিয়া ছিল আগ্রহী। তার এই আগ্রহে মোটেই খুশী ছিল না যুক্তরাষ্ট্র। ভারত মহাসাগর একটি ' রুশী হ্রদ'- এ পরিণত হচ্ছে, এই রকম বাক্য প্রায়শই উচ্চারিত হতো মার্কিন নৌবাহিনীর অধিনায়কদের মুখে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় নৌবাহিনী অধিনায়কদের সামনে সুযোগ এসে যায়। জরুরি আলোচনার পর তারা কিসিঞ্জারকে পরিকল্পনা দেন। তাদের পরিকল্পনার শিরোনাম ছিল ' প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারির জন্য স্মারকলিপি',- আর উপস্থাপিত বিষয়ের শিরোনাম করা হয় ' পাকিস্তান-ভারত অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর কার্য প্রক্রিয়া প্রদর্শণার্থ খসড়া।'

৯ ডিসেম্বরের দিনটি ছিল নিকসনের জন্যে অনেকটা ঝামেলা বিহীন। এদিনে কিছু সাধারণ নিয়োগ দানের কথা ঘোষণা দেন এবং ১৭ ডিসেম্বরকে 'রাইট ভ্রাতৃদ্বয় দিবস' ঘোষণাপত্রে সই করেন। দিনের বেশির ভাগ আলাদা করা ছিল অন্য বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ দানের জন্যে।

হোয়াইট হাউসের উল্টো দিকে একটি সুরক্ষিত সড়কের ওপর নিকসনের নির্বাহী অফিস। সেখানে ঢুকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। হোয়াইট হাউসের যে গুটিকয়েক উপদেষ্টা যে কোন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন, এই নির্বাহী অফিস তাদের জন্যও ছিল অপ্রবেশ্য।

অফিস কক্ষটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে তার পূর্বসূরীদের স্মারকে সজ্জিত করে, যারা একদা তার মতোই ছিলেন এখানে।

কিছুই সেখানে সাধারণ ছিল না। নৌবাহিনীর পরিকল্পনা তার সামনে পেশ করা হয় তার অনুমোদনের জন্য। এটা কিসিঞ্জারের ভূগর্ভস্থ কমান্ড কক্ষ হতে খামে ভরে মুখ আটা হয়। তাতে বলা হয়, নৌবাহিনীর একটি শক্তিশালী টাস্ক ফোর্স বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানি লক্ষ্যস্থল থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে পরিচালিত করা ও পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলে ঘাঁটি গেড়ে বসা ভারতীয় বিমানবাহী জাহাজ "বিক্রান্ত" কে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা। এবং সময় মতো পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র বন্দর ঘিরে সৃষ্ট ভারতীয় অবরোধকে ভেঙ্গে ফেলা।

মালাক্কা প্রণালীতে টাস্ক ফোর্স যাতে সর্বপ্রথম দৃশ্যমান হয়, পরিকল্পনায় এটি নিশ্চিত করা হয়। করা হয় এই জন্য যে, টাস্ক ফোর্সের অগ্রসরমানতার মধ্য দিয়ে রুশ ও ভারতীয়দের সতর্ক করে দেয়া হবে। একবার সুবিধা মতো অবস্থানে পৌঁছলে টাস্কফোর্স ১২ মাইল সীমানার বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠাবে। এর সাথে সমন্বয় ঘটাবে এস আর—৭১এস বিমান। স্থলভাগের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে ঘণ্টায় ২ হাজার মাইল গতিতে। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দ্রুতগামী বিমান। আরো কয়েকটি বিমান নজর রাখবে রুশ নৌবহরের ওপর এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীকে প্রলুব্ধ করানোর চেষ্টা করবে।

পরিকল্পনায় ৮২তম বিমানবাহী ডিভিশনের একটি অংশ নিয়োগের চিন্তাভাবনা করা হয়। এবং উত্তর ক্যারোলাইনের পোপ বিমান ঘাঁটিতে পরিবহণ বিমান জড় করার কথা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাশিয়া যাতে আমেরিকার প্রস্তুতির বিষয়টি জানতে পারে সে উদ্দেশ্যে আফ্রিকার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার অনুমতি চাইতে বলা হবে। অনুমতি লাভের জন্য অনুরোধের আবরণ হবে মানবিক মিশনের জন্য উড্ডয়ন, পাকিস্তান থেকে শরণার্থীদের নিয়ে আসা।

প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাটি নিয়ে ভাবেন গভীরভাবে এবং অনুমোদন দেন। খুঁটিনাটি বিষয়ে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হলো। ফোর্সের অগ্রভাগে দেয়া হলো পারমাণবিক শক্তিচালিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর জাহাজ 'ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ।' এই বিমানবাহী জাহাজটি পাঁচ হাজারের বেশি সৈন্য, পঁচাত্তরটি জঙ্গী বিমান ও পাঁচটি হেলিকপ্টার বহন করে। টাস্ক ফোর্সে অরো ছিল ' কিং' 'ডিকাটুর' ও 'পারসন্স' নামের তিনটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ডেস্ট্রয়ার। ছিল বউসেল', 'অরলেক', মেককিয়ান,' ও 'এন্ডারসন' নামের চারটি বিমান বিধ্বংসী কামান সজ্জিত ডেস্ট্রয়ার। হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ ' ত্রিপোলী' তে ছিল মেরিন পরিচালিত পঁচিশটি আক্রমণকারী হেলিকপ্টার ও দুই কোম্পানী মেরিন সৈন্য। এ ছাড়া ছিল সরবরাহ জাহাজ। পরে বহরের সাথে যুক্ত হয় তিন বছর বয়সী নৌবাহিনী তেল ট্যাংকার ' উইচিটা'।

নৌবহরকে মালাক্কা প্রণালীতে জড় হতে নির্দেশ দেয়া হলো। আশা করা হলো প্রথম জাহাজটি ১২ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন সময় রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে পৌঁছবে। তিনদিন পর সবগুলো জাহাজকে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতে বলা হলো।

জয়েন্ট চীফস অব স্টাফ প্রেরিত সর্বোচ্চ গোপন বার্তায় টাস্ক ফোর্সের ক্যাপ্টেনদের সতর্ক করে দেয়া হয়। তাতে বলা হয়ঃ ' মার্কিন বাহিনীর জন্য প্রাথমিক হুমকি আসবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছ থেকে। এরা সমুদ্র পথে পাকিস্তানের দুই অংশে প্রবেশ নিরোধে নিয়োজিত রয়েছে। সিয়াটো (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা) বাহিনীর অগ্রসরমানতা তাদেরকে দুর্বল করবে। যুদ্ধ জাহাজ মোকাবেলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছে আছে প্রচলিত বোমা, রকেট, মেশিনগান ও কামান। জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর অস্ত্রাগারে।'

টাস্ক ফোর্স ৭৪-এর প্রথম পর্যায়ের শক্তি - ' এন্টারপ্রাইজ' ও চারটি ডেস্ট্রয়ার ইয়াংকি কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করে। কেন্দ্রটি ভিয়েতনাম উপকূল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় শক্তি হেলিকপ্টারবাহী ' ত্রিপোলী' ও তিনটি ডেস্ট্রয়ার ফিলিপাইনের সুবিক উপসাগর থেকে রওনা করে। জাহাজগুলোর সঙ্গে হাওয়াইয়ের প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ড ও ওয়াশিংটনের উর্ধ্বতন কমান্ডের সঙ্গে বেতার বার্তা বিনিময় শুরু হয়ে যায়।

যেসব বার্তার বিনিময় ঘটে তাতে এই অভিযানের গোপনীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। টাস্ক ফোর্সকে আদেশ অনুসারে তার গমন পথের পরিবর্তন ঘটাতে নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয় ' স্পিক্যাট এক্সক্লুসিভ' সংকেত বার্তায় পরিস্থিতির

রিপোর্ট পাঠাতে। ' স্পিক্যাট এক্সক্লুসিভ' একটি সাংকেতিক নাম। সামরিক গোপনীয়তার শ্রেণী বিভাজনে এর অবস্থান সর্বোচ্চে। রিপোর্ট বিতরণের পরিসর ছিল সীমিত। রিপোর্ট করা হতে থাকে শুধু পার্ল হারবারে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অধিনায়ক, নৌবাহিনী অপারেশন প্রধান ও জয়েন্ট চীফস অব স্টাফের কাছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল জন এস ম্যাককেইন ছিলেন একজন সাবমেরিন সৈনিক এবং এক বছর কাটিয়েছেন নৌবাহিনীর তথ্যবিভাগের প্রধান হিসেবে। পার্ল হারবারে তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধে নৌবাহিনীর সংশ্লিষ্ট অংশের পরিচালনায় ছিলেন। এমন কী তার পুত্র, যিনি ছিলেন নৌবাহিনী জঙ্গী বিমানের পাইলট,— তিনি যখন উত্তর ভিয়েতনামে ধরা পড়েন, তখনো অ্যাডমিরাল ম্যাককেইন ছিলেন ওই দায়িত্বে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে নৌবাহিনীর মতধারা ও নীতি প্রচারের মুখ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার অভিজ্ঞতা ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে হামলা চালানোর দায়িত্ব পাবার যোগ্যতাই তাকে টাস্ক ফোর্স পরিচালনার ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

জয়েন্ট চীফস অব স্টাফের কাছে ১১ ডিসেম্বর প্রেরিত এক বার্তায় ম্যাককেইন সোভিয়েত জাহাজের খোঁজে ভারত মহাসাগরে আকাশ অনুসন্ধানের অনুমতি চাইলেন। জয়েন্ট চীফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান থমাস মুরার তাকে মালাক্কা প্রণালীতে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। তার বার্তায় বলা হলো : এর পরই টাস্ক ফোর্সকে নজরদারির অনুমোদন দেয়া গেল। সোভিয়েত অপারেশনের নির্দেশনার প্রতিও নজরদারি চালাতে হবে।' (অবশ্য মার্কিন উপগ্রহ রুশ জাহাজের ওপর দৃষ্টি রেখে চলেছিল।'

আরেকটি বার্তায় অ্যাডমিরাল ম্যাককেইন জয়েন্ট চীফস অব স্টাফকে বলেন, ১৩ ডিসেম্বর মালাক্কার প্রবেশ মুখে গ্রীনিচ সময় সকাল ৮ টায় টাস্ক ফোর্স পুরো দৃশ্যমান হবে। আর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায়।

টাস্ক ফোর্স যাচ্ছে ঢাকা থেকে আমেরিকানদের আনতে—এই ভাষ্য তখনো চালু রাখা হয়। ইতোমধ্যে টাস্ক ফোর্স ৭৪-এর অধিনায়ক রিয়াল অ্যাডমিরাল ডি ডবলিউ কুপার তার নৌবহরের সকল জাহাজকে যুদ্ধকালীন সতর্কাবস্থায় প্রস্তুত করে ফেলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "কোন সোভিয়েত বিমানের কোন দেশের আকাশ সীমা অতিক্রমণের সম্ভাবনা ক্ষীণ।" কারণ সোভিয়েতের একমাত্র পর্যবেক্ষণ বিমান 'ব্যাজার',— যা কোন দেশের আকাশ সীমা লঙ্ঘন না করে ভারত মহাসাগরে পৌঁছতে পারে, সেটা এখন আছে চার হাজার মাইল দূরত্বে কায়রো ঘাঁটিতে।

করণীয় অগ্রাধিকার সম্পর্কে আগেই ভোজবাজি খেলার অবতারণা করা হলেও আরেকটি বার্তায় টাস্ক ফোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়ঃ ' সম্ভাব্য ঘটনা মোকাবেলায় একটি বাহিনী গঠন করতে হবে— যে বাহিনী হেলিকপ্টারের সাহায্যে বেসামরিক লোকজন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম এবং আত্মরক্ষা ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় টাস্কফোর্সের উপনামটি ছিল নেহায়েৎই স্থূল। নামটি ছিল 'ওহ ক্যালকাটা।'

নৌবাহিনী পরিকল্পকরা যা ধারণা করেছিলেন তার থেকেও দ্রুত গতিতে টাস্কফোর্স প্রেরণের সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। এর নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। খবরটি ইয়াহিয়াকে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার যুক্তিতে এনে দাঁড় করায়। আর ভারতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, টাস্কফোর্স একটি ভারতীয় ডেস্ট্রয়ারকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এবং বোধগম্য কারণেই বেসামরিক লোকজন মারমুখী হয়ে ওঠে। বোম্বের মার্কিন কনসাল জেনারেল ব্যাপক মার্কিন বিরোধী বিক্ষুব্ধতার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা পাকিস্তানি বিমান হামলা নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু আমরা সাধারণ জনতার কর্ম প্রক্রিয়া নিয়ে সতর্ক।'

১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রুশ রাষ্ট্রদূত পেগভের কাছে মার্কিন নৌবহর সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের কথা জানান। তিনি তাদের উদ্বিগ্ন হতে মানা করেন। সিআইএ রুশীদের সঙ্গে ভারতীয়দের এই গোপন আলোচনার রিপোর্ট পেয়ে যায়।

সিআই-এ এর রিপোর্টে পেগভের ভাষ্য তুলে দেয়া হয়, ' ভারতকে ভীতি প্রদর্শন ও পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ পরিচালনায় নিরুৎসাহিত করা এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করা হয়েছে।' সিআই এ রিপোর্টে অশুভ যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয় সেটা হচ্ছে : ' পেগভ উল্লেখ করেছেন যে, একটি সোভিয়েত নৌবহর এখন ভারত মহাসাগরে আছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সপ্তম নৌবহরকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না।'

এতে সাহসের বড়াই দেখানো হয় কিন্তু এ কথাও বলা যাবে না যে, রাশিয়া তার মিত্রদের শুধুই শূন্য গর্ভ আশ্বাস দেয়ার অভ্যাস রপ্ত করেছে। পেগভ তার উচ্চারিত বাক্যকে আরো শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারতেন। কেন না, আরো একটি সোভিয়েত নৌবহর নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত 'ক্রেসতা' শ্রেণীর ক্রুজদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছিল মার্কিন টাস্ক ফোর্সের পেছন পেছন এবং খুব বেশি দূরেও ছিল না। এছাড়া আরেকটি রুশ সাবমেরিন পিছলে গিয়ে প্রবেশ করে জাপান সাগরে। অন্যদিকে ব্লাডিভোস্টক থেকে আরেকটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ক্রুজার বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

যে সব বিদেশী ঢাকা ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের অপসারণ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং টাস্কফোর্স বিদেশী অপসারণ সংক্রান্ত অজুহাত তোলার সুযোগ হারায় তথাপি জাহাজ সামনে এগোতে থাকে। বঙ্গোপসাগরের অপেক্ষমাণ বিশ্বশান্তির প্রতি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হোয়াইট হাউস ও পেন্টাগণ, দু'পক্ষই জ্ঞাত ছিল। পাশাপাশি এও পরিষ্কার ছিল যে, মার্কিন জনগণ একজন মদ্যপ একনায়কের রাজত্বকালের অবশেষে রক্ষায় এতবড় ঝুঁকি মেনে নেবে না। যে বিপদ, যা ঘটতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকি; তা নিজ জনগণকে না জানিয়ে মার্কিন সরকার তার প্রতারণার কূটনীতি অব্যাহত রাখে অপসারণের কথা বলে এবং অথচ সে অপসারণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েও যায়। এটা নিশ্চিত যে, না রুশী না ভারতীয়— কাউকে বিভ্রান্ত করা হয় নি। শুধু মার্কিন জনগণকে বোকা বানানো হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে যে সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল, তা অস্তিমান হয়ে ওঠে ১৫ ডিসেম্বরে। পিকিংয়ের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ভারতীয় দূতাবাসে এক লিপি প্রেরণ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে চৈনিকরা তাদের প্রথা সিদ্ধ তলোয়ারের ঝনৎকার আবার শুরু করেন। লিপিতে জোরের সাথে বলা হয়, ১০ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যের দুটো দল পর্যবেক্ষণ মিশনে বেরিয়ে সিকিম দিয়ে চীনা সীমান্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। চৈনিকরা এই অনুমান ভিত্তিক প্রবেশকে ' মারাত্মক সীমালংঘন' বলে অভিহিত করে এবং দৃঢ়তার সাথে বলে, ভারতকে 'চীনা ভূখণ্ডে অনধিকার প্রবেশের এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।'

১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণের আগে চীন একই অভিযোগ তোলে। ১৯৭১ সালে চীনের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি মাত্র। কিন্তু আমরা জানি না চীনের দাবি অনুযায়ী ভারত তার কোন এলাকায় ভূখণ্ডগত সীমানা লংঘন করে। তবে জায়গাটি ছিল সেই এলাকায়, যেখানে কয়েকদিন আগে চৈনিক সৈন্যদের 'জরুরী উদ্দেশ্যে' সতর্কাবস্থায় রাখা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা অবশ্য চীনকে দ্রত সামনে এগিয়ে আনতে থাকে। যখন পিকিং তার কূটনৈতিক কৌশল কাজে লাগানোর চেষ্টায় নেমে পড়ে, যা একটি দেশকে পরিচালিত করতে পারতো প্রতিবেশী দেশের ওপর আক্রমণ হানায়, সেই সময় পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী ঢাকার মার্কিন কনসাল জেনারেল অফিসে হাজির হন সাহায্য চাইতে।

তিন ভারতীয়দের প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানাতে চাইছিলেন। কিন্তু ভারতীয় বোমাবর্ষণে তার রেডিও ট্রান্সমিটার ধ্বংস হয়ে যায়। মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভাক বার্তা প্রেরণে আচরণ বিধি অনুসরণ করেন। নিয়াজীর অনুরোধ সরাসরি ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেন। পররাষ্ট্র দপ্তরে এটা পৌঁছে ঢাকা সময় সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মিনিটে।

শান্তির পক্ষে ওকালতি চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পররাষ্ট্র দপ্তরে জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধ বিরতির বার্তাটি নিয়ে ত্বরিৎ কোন পদক্ষেপ নেয় না। পাঠিয়ে দেয়া হয় ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করে, এবং নিশ্চিত করবেন যে, যুদ্ধ বিরতি গ্রহণে তিনি সম্মত আছেন। পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রেরিত ফারল্যান্ডের প্রথম জবাবটি ছিল 'দ্ব্যর্থক।' ঢাকার সময় রাত ৩টা ৩০ মিনিটের আগেই ওয়াশিংটন ইসলামাবাদ থেকে পাকাপাকি স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

মার্কিন সরকারের রেডিও বার্তা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় মূহূর্তে পৌঁছে যেতে পারে। তথাপি এই জীবনমৃত্যুর এই মিশন পরিচালনায় বার্তাটি জানান দেয়ার জন্য ওয়াশিংটনে কূটনৈতিক অভ্যর্থনা প্রদানের পদ্ধতি বেছে নেয়। জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধিদের লাগিয়ে দেয়া হয় পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর খোঁজে। দু'জনের কাউকেও পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে


Northern University * Bangladesh
NUB Library

রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের কাছে পাঠানো হলো। পৌঁছলো ১২টা ৫৬ মিনিটে। আরও দেড় ঘণ্টা ব্যয় হলো বার্তার সংকেত লিপির পাঠোদ্ধার, ভারতীয় কর্মকর্তাদের খুঁজে বের করা ও তাদের হাতে অর্পণে। আরো বেশ কিছু মিনিট নষ্ট হলো বাংলায় ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে প্রেরণে।

যে মূহূর্তে নিয়াজি কনস্যুলেটে হাজির হন তখন থেকেই কামান স্তব্ধ হয়ে যায়। এবং পেরিয়ে যায় একুশ ঘণ্টা। আরো রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার মাটি। পররাষ্ট্র দপ্তর বলতে থাকে এই বিলম্ব এড়ানো সম্ভব ছিল না। এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করা কিংবা নিয়াজির সিদ্ধান্ত উল্টে দেয়ার অভিপ্রায়ও তাদের ছিল না।

পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য একুশ ঘণ্টা ধরে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়, ওয়াশিংটন তা গোপন করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। চীনের জন্য অবশ্য এটা যথেষ্ট সময় ছিল না। যদিও আক্রমণ পরিচালনার জন্য সে তার বাহিনী প্রস্তুতও করে রেখেছিলো। অন্যদিকে সিনকিয়াং অভিমুখী কোন কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে রুশদের জন্য আর কোন অজুহাত রইলো না এবং যখন যুদ্ধ থেমে যায়, টাস্ক ফোর্স-৭৪ তখনো সংঘর্ষ এলাকা থেকে অনেক দূরে ছিল।

বিশ্ব বেঁচে যায় কিন্তু কোন বৃহৎ শক্তি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। যুদ্ধ বন্ধ হয় রুশী, মার্কিন অথবা চৈনিকদের ভীতি প্রদর্শনের আতংকে নয়, — বন্ধ হয় প্রাচ্যের প্রাচীন ঔষুধি প্রয়োগের কারণে। 'এই যুদ্ধের ভিতরে সন্দেহজনক কিছু রয়েছে।' জাতিসংঘ সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল পল মার্ক হেনরি আমাদের বলেন, 'পশ্চাৎ দৃকপাতে মনে হয় পুরোটা আগেই মঞ্চায়িত, পূর্বাহ্নে বন্দোবস্ত কৃত। জেনারেল (নিয়াজিই পাকিস্তানি সেনা কমান্ডার) আছেন এর মূলে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে। এই যুদ্ধ পরিত্যাগে তাদেরকে ঘুষ দেওয়া হয়।'

আত্মসমর্পণে সাড়া মেলাতে ভারতীয়রা বন্দুকের গুলি ছোড়া বন্ধ করতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করে না। চীন সীমান্তের প্রতি দৃষ্টি রেখে পাকিস্তানের মতামতের জন্য বিলম্ব না করে তারা তাৎক্ষণিকভাবে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। সম্ভবত : ক্রোধ দমন করতে এক ঘণ্টা বিলম্ব করেন পাকিস্তানি একনায়ক এবং শেষ পর্যন্ত দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হন।

পূর্ব পাকিস্তানের নারকীয় মৃত্যু-যন্ত্রণা ও তীব্র জন্ম-যন্ত্রণার কথায় আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম এক্ষেত্রে সর্বাংশে নিন্দনীয়। মানব জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন স্পষ্টতই একই রকমের নির্মম। আমেরিকার নৈতিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের ইতিহাস দু'শ বছরের। ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের প্রতারণা ও কাপট্যের যে তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো, তা শুধু মার্কিন সরকার ও জনগণের লজ্জাই বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্র মারাত্মক ভুল করে এমন এক পরিস্থিতিতে, যা অবিশ্বাস্য রকমের এক বিশালকায় যুদ্ধের জন্ম দিতে পারতো। প্রেসিডেন্ট শক্তির ভারসাম্যতা নিয়ে এক হঠকারী খেলায় মেতেছিলেন।
